তন্ত্ররশ্মি

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী

যোগমায়া আশ্রম
লাবান, শিলং
মেঘালয়

প্রকাশক : যোগমায়া আশ্রমের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দেব ক্রোরী কর্তৃক প্রকাশিত। লাবান, শিলং, ৭৯৩ ০০৪

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীরূপেন্দু চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান :

১। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
২। উচ্চারণ, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
৩। সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাঃ লিঃ, ২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬
৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬
৫। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ৫৬, সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
৬। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, পানবাজার, গুয়াহাটি, আসাম।
৭। যোগমায়া আশ্রম, লাবান, শিলং, ৭৯৩০০৪

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত কুমার রায়, শ্রীসারদা প্রিন্টিং, ৩১/১ সোম লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

ওঁ হ্রীঁ

মৎ প্রাণঃ শ্রীগুরু প্রাণঃ মদ্দেহ শ্রীগুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমস্তু বহির্বেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥

তন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ ঠাকুর সূর্য্যানন্দনাথ, যাঁহার সুশীতল পদছায়ায় আমার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ-যুগলে "তন্ত্ররশ্মি" অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিলাম।

প্রার্থনা—"(শুধু) তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।"

কৃপাপ্রার্থী—
আশুতোষ
(ক———)

তন্ত্র ভারতে আসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কুব্জিকা' তন্ত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে সদাশিবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার আগেও তন্ত্রের কিছু কিছু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। সদাশিব সেইগুলিকে একত্রীকরণ করিয়া নূতন রূপদান করিয়াছিলেন। সদাশিবের সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালে এবং বৌদ্ধ ও জৈনযুগে অনেক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল।

তন্ত্র একটি লোকায়ত ধারারূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রবহমান। ইহা কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কত শাখা-প্রশাখায় সম্প্রসারিত হইয়া দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই।

তন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানার কৌতূহল বহু লোকের কম বেশি আছে। আবার একদলের সন্দেহ, অপর দলের ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমান। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষ শাস্ত্রের অনুশাসন যুক্তির দ্বারা যাচাই না করিয়া অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে নারাজ। তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ এবং যন্ত্র মন্ত্রাদির ভিত্তি যে গভীর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধারাবাহিক চর্চ্চার অভাবে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। অনুশাসনগুলিকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সমর্থ সাধকবৃন্দ কর্ত্তৃক গভীর গবেষণা।

তান্ত্রিক সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দের সঙ্গে যুগপৎ আরও কয়েকটি শব্দ আমাদের মানসপটে ভাসে, যথা—সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য। ইহাদের আভিধানিক অর্থ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। **সংস্কৃতি**—সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ।

২। **সভ্যতা**—জীবনযাত্রা প্রণালীর উৎকর্ষ।

৩। **কৃষ্টি**—গবেষণামূলক চর্চ্চা, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ। ইংরেজীতে বলা হয় culture.

৪। **ঐতিহ্য**—পরম্পরাগত উপদেশ বাক্য। Tradition. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী culture শব্দের বাংলা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রকর্ষ' বা 'চিত্তোৎকর্ষ'।

আমরা এখানে উপরোক্ত শব্দগুলির মিলিত ভাবধারায় যাহা বুঝায়, তাহাই সংস্কৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। আবার প্রাচীন মহান্ ঐতিহ্যকে জাতির তৎকালীন সংস্কৃতি বলা হইয়া থাকে এবং পরবর্ত্তীকালে বংশধরগণ সগৌরবে ইহার অধিকারী হন। ইহার অভাবে জাতির যে পরিমাণ অপূরণীয় ক্ষতি হয়, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

মানুষের সামগ্রিক শিল্প-অভিব্যক্তি অর্থাৎ নাচ, গান, সাহিত্য ইত্যাদিতে সমষ্টিগত যে ভাবের প্রকাশ হয়, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ সংস্কৃতি বলিয়া থাকি। বৈদিক সাহিত্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সংস্কৃতি কথাটির উল্লেখ আছে। মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি জনসমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার রূপদানকেই সংস্কৃতি বলা হয়। ইহার মধ্যে নিহিত আছে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান।

অন্যদিকে মানব-চিন্তার শ্রেষ্ঠ বিকাশের নিদর্শন পাওয়া যায় তার সংস্কৃতিতে এবং ইহাই একটি জাতির চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর বহন করে। এই কারণে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সংস্কৃতির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন সংস্কৃতির মহত্ত্ব উহার বাহ্য আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না। উহা মানবাত্মার মহনীয়তার পূর্ণ বিকাশ। যে সংস্কৃতিতে আত্মার স্বরূপ ও সামর্থ্যের বিষয় যত বিশদরূপে প্রস্ফুটিত হয়, ঐ সংস্কৃতির গৌরব তত অধিক। বৈদিক ঋষিরা গাহিয়াছেন ঃ—

"শৃণন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥"

(হে অমৃতের পুত্রগণ! যাহারা দিব্যধামে আছ, শোন। জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি। তিনি সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপারে বিরাজমান।

মানবাত্মাই এই মহান্ আদিত্যবর্ণ পুরুষ, যাঁহাকে জানিলে মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। ইহা হইল বৈদিক সংস্কৃতির চরম পর্য্যায়ের রূপদান বা অবদান)

এখন এই মানদণ্ড দ্বারাই তান্ত্রিক সংস্কৃতির মহত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্র দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে—'যদিও আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ, তথাপি ইহার প্রবুদ্ধ অবস্থা শ্রেষ্ঠ'। সেইজন্য তান্ত্রিক সংস্কৃতির স্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে মানব আত্মাকে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না), তাঁহাকে জাগিতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রের উদাত্ত ঘোষণা—"**প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ**"। এই বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিল। যে পূর্ণত্বকে মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, ইহার উপলব্ধির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অনাদি নিদ্রা হইতে জাগরণ বা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধন। ইহার পর আত্মার ধারাবাহিক উর্দ্ধগতি এবং অন্তে পরমপদের পূর্ণ উপলব্ধি এবং সাক্ষাৎকার লাভ। এই কারণে তান্ত্রিক যোগ অথবা জ্ঞান সাধনার মূল লক্ষ্য সুপ্ত আত্মাকে জাগরিত করা।

এই জাগরণের সহজ অর্থ নিজস্ব শক্তির বিকাশ, যার ফলে মানুষ মাথা তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিতে পারে—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। 'উঠ, জাগো, চরৈবেতি' শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় অনুরূপভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী—

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

পদ্যানুবাদ—"ক্লীবত্বে বিকল পার্থ! না হও এথায়,
না হয় শোভন এই ক্লীবত্ব তোমায়;
হৃদয়দৌর্বল্য হীন করি পরিহার,
পরন্তপ! উঠি তুমি দাঁড়াও এবার।"

(হে অমৃতের সন্তান! তুমি নিজে শক্তিধর, সুতরাং সবরকম ক্লীবত্ব পরিহারপূর্ব্বক উন্নত শিরে বিশ্বসভায় এক বরেণ্য আসন গ্রহণ কর। পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সিংহের মত মহারণ্যে নির্ভীকভাবে বিচরণ কর। অজ্ঞানান্ধকারের প্রাচীর ভেদ করিয়া আত্মোপলব্ধির মহানন্দ স্বয়ং পরিপূর্ণভাবে উপভোগ কর এবং এই পরিস্ফুট শক্তির বহুমুখী ঐশ্বর্য্যের অংশীদার হওয়ার জন্য বিশ্ববাসীকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন কর।)

মানুষের দেহ-মনের আড়ালে যে মহান্ সত্ত্বা বিরাজমান, তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া লোকের কাছে তুলিয়া ধরিলে কাহারো কিছু অপ্রাপ্তি-বোধ থাকিবে না।

উপরোক্ত 'প্রবুদ্ধ' অবস্থার পর তন্ত্রশাস্ত্রে 'সুপ্রবুদ্ধ' অবস্থার বর্ণনা আছে। ইহা অতীব দুরারোহ। সেই স্তরে পৌঁছিলে পূর্ণতা বা জীবন্মুক্তি লাভ হয়। যার ফলে শিব-শক্তির সামরস্য প্রাপ্তি ঘটে এবং তাঁহাদের পৃথক পৃথক রূপের বিলোপ সাধিত হয়। ইহা মহাশক্তির মহতী কৃপা সাপেক্ষ।

এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ভূমিকার অংশবিশেষ পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থিত করিতেছি।

"পুরাতনের সঙ্গে সংযোগ হারাইলে জাতি বাঁচে না। শিকড় কাটিলে গাছ বাঁচে না। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হইলে জাতির জীবনে মৃত্যু আসে। এই কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে রোম, গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের বিরাট সভ্যতার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে।"

মহান্ তন্ত্রদর্শন যোগ্য স্বীকৃতিদানের অভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপদানের

জন্য তন্ত্রশাস্ত্রকে তাঁহার যোগ্য স্থানে না বসাইলে পরিণাম হইবে ভয়াবহ। জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করিতে হইলে আমাদের দেশে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে দেওয়া কোন অবস্থায় সঙ্গত হইবে না।

'তন্ত্র' শব্দের তাৎপর্য্য

বৌদ্ধতন্ত্র মতে—**"তন্যতে বিস্তয়তে জ্ঞানং অনেন ইতি তন্ত্রম্।"** তন্ ধাতু বিস্তার অর্থে 'তন্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্ত্র এবং বেদ উভয়ের একই প্রতিপাদ্য—বেদান্তবেদ্য অদ্বৈত তত্ত্ব। পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই যে শক্তি তাহাতে দ্বিমত নাই। বেদে ব্রহ্মের যে অংশ দেখান হয় নাই বা উপেক্ষিত, তন্ত্রে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাইতে পারে যে 'বাক্' হইতে যদিও সৃষ্টি, লয়, বন্ধন এবং মুক্তি, তথাপি তাহারই অন্তর্গত অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণমালা বা মাতৃকা শক্তির সবিশেষ উল্লেখ বেদে নাই। বেদে বা উপনিষদে শব্দ প্রতীকরূপে কেবলমাত্র 'অ' 'উ' এবং 'ম' কে নিয়ে ওঁকার নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। উপনিষদে **'কং ব্রহ্মেতি'** এবং অথর্ববেদে **'সহস্রাক্ষরা পরমেব্যোমন্'** এর উল্লেখ আছে। অন্যদিকে পঞ্চাশ বর্ণমালা তথা মাতৃকা শক্তির কথা সবিস্তারে তন্ত্রশাস্ত্রেই আলোচিত। যাবতীয় বীজমন্ত্র মাতৃকাবর্ণের সাহায্যে রচিত হইয়াছে। বীজমন্ত্রের অমোঘ শক্তির মুখ্য কারণ এই যে ইহার উপাদান শব্দব্রহ্ম হইতে আগত মাতৃকা শক্তি। তন্ত্রই শক্তির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া মানুষের সামনে পরম বিস্তার বা জাগরণ আনিয়া দিয়াছেন; যার ফলে বিশ্বের সঙ্গে মেলামেশা তথা বিশ্বমৈত্রী স্বপ্ন না থাকিয়া বাস্তবরূপ নিয়াছে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে সমগ্র বেদের শব্দরাশিকে মন্ত্রময় বলা হয়; কিন্তু মন্ত্রবিজ্ঞান একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্রেই প্রকাশিত।

দ্বিতীয়তঃ তনুকে ত্রাণ করে বলিয়া 'তন্ত্র' নাম হইয়াছে; কারণ মুক্তির পথে শরীর একটি বড় বাধা। তন্ত্রই আমাদিগকে শিক্ষা

দেন শরীরের মধ্যে সেই বাধাগুলি কোথায় এবং কি করিয়া সেগুলিকে অতিক্রম বা অপসারণ করা যায়। তন্ত্র দেহবিজ্ঞানের উপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করেন।

"ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ।
দেহং দেবালয়ং প্রোক্তং স জীবং কেবল শিবঃ॥"

(ত্রিলোকের সবকিছু দেহের মধ্যে অবস্থিত। দেহই দেবালয় এবং জীব মাত্রেই শিব)

দেহভাণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখা অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই এই দেহে বর্ত্তমান—ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করার নির্দ্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। (এমনকি পরমাত্মাও এই দেহে বর্ত্তমান। এই ক্ষুদ্র সীমিত দেহে অসীমের সবকিছু ছোট সসীম আকারে অবস্থিত।) ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয় **Macrocosm in Microcosm.** আমাদের দেশে প্রচলিত "যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে এই ভাণ্ডে" প্রবাদবাক্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। দেহের বাধাগুলি অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রসারতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই হেতু তনু এবং মন নিয়া তন্ত্রে বিশদ আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তন্ত্রশাস্ত্র রচনায় মনস্তত্ত্ব এবং প্রকৃতির ভূমিকা ইহাকে বাস্তব এবং জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

("আপনারে আপনি দেখ, যেয়োনা মন কারু ঘরে,
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।")

ইহাই ভারতের সনাতন বাণী। আমাদের দেশ চিরকালই আত্মজ্ঞানকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং সেই লক্ষ্যে সহজে পৌঁছিবার জন্য কঠোর সাধনার সাহায্যে নানাবিধ পন্থার আবিষ্কার করা হইয়াছে। আত্মাকে জানিয়াই ভারতের ঋষি কূটস্থ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। যার ফলে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ভাবধারা যে কোন জাতির দর্শনের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। তন্ত্রশাস্ত্র দ্বৈত জগতের মধ্য দিয়া সাধককে অদ্বৈত তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইহা আগম এবং নিগম দুই ভাগে বিভক্ত। আগমশাস্ত্রে প্রশ্নকর্ত্রী গিরিজা এবং উত্তরদাতা মহাদেব। আবার নিগমশাস্ত্রে প্রশ্নকর্ত্তা মহাদেব এবং উত্তরদাত্রী গিরিজা। শিব ও পার্ব্বতীর মধ্যে যেমন স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ আগম ও নিগমশাস্ত্রে কোন ভেদ নাই। উভয়ের একই লক্ষ্য—জীবের উদ্ধার। এতদ্ব্যতীত লীলামাধুর্য্য আস্বাদন হয়ত ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ॥"

উপরোক্ত শ্লোকের 'আগত', 'গত' এবং 'মত' শব্দের আদ্যক্ষর নিয়া "**আগম**" নাম হইয়াছে।

আবার

"নির্গতং গিরিজা বক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকের 'নির্গত', 'গত' এবং 'মত' শব্দের আদ্যক্ষর নিয়া "**নিগম**" নাম হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে স্বয়ং নারায়ণ ইহাকে স্বরূপ-তত্ত্ব জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

তন্ত্রের দুই দিক

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় তন্ত্রের দুইটি দিক্ আছে—প্রথমতঃ তন্ত্রের মতবাদ, সিদ্ধান্ত এবং তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান (Theoretical); দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রের আনুষ্ঠানিক জ্ঞান (Practical)।

প্রথমটিকে লইয়া আমরা এই গ্রন্থে যথাসাধ্য প্রাথমিক আলোচনায় ব্যাপৃত হইব। আমাদের সমাজে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অপসারণের নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে তন্ত্র মুখ্যতঃ ক্রিয়ামূলক সাধনশাস্ত্র। ইহাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত

করিতে হইলে সমর্থ গুরু হইতে উপদেশ গ্রহণ, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ক্রিয়ার অভ্যাস এবং সর্ব্বোপরি ক্রিয়ার প্রতি স্তরে গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষতঃ তন্ত্রের শবসাধনা, ষট্‌চক্র ভেদ এবং পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া গুরু সান্নিধ্য অপরিহার্য্য। এমনকি শব-সাধনায় গুরু স্বয়ং উত্তর সাধকরূপে মহাশ্মশানে শিষ্য হইতে অনতি-দূরে অবস্থান করিয়া সাধনার সঙ্কটমুহূর্ত্তে শিষ্যকে প্রেরণাদানে উৎসাহিত করতঃ লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেন।

শক্তিতত্ত্ব

শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রশাস্ত্র রচিত। সুতরাং শক্তি নিয়া আলোচনার সূত্রপাত করা বাঞ্ছনীয়।

শক্তিতত্ত্ব দ্বিধা বিভক্ত—(১) **ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি**, (২) **গুণাতীতা আনন্দঘনরূপিণী চিৎশক্তি।**

মায়াশক্তি দ্বারা এই বিচিত্র সংসার বিরচিত হইয়াছে। চিৎশক্তি পুরুষ-প্রকৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্ব-স্বরূপে নির্লিপ্ত থাকিয়া জীবরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডলীলার অভিনয় করিতেছেন।

মায়াময় জগতে জড় বলিয়া যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও বস্তুতপক্ষে সত্য নহে—ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। সেই ভ্রান্তিও আবার ব্রহ্মশক্তির বিভূতি বিশেষ। সেই বিভূতিরই নামান্তর মায়া। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার রজস্তমোগুণ-প্রধান অংশের নাম 'অবিদ্যা'।

তন্ত্রশাস্ত্র মতে শিব ও শক্তি অভিন্ন। সেইজন্য ইহা অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্ব। শিবই শক্তি এবং শক্তিই শিব—একে অন্যের স্বরূপ। শিবের মধ্যে শক্তি অন্তর্লীন—ইহাই শাক্তাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অথবা অদ্বৈত তত্ত্ব। অগ্নিকে বাদ দিয়া যেমন তাহার দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না, সেইরূপ দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। বিখ্যাত

তন্ত্রবিদ্ স্যার জন উড্রফ্ লিখিয়াছেন—"It is beyond all human conceptions and imaginations"—ইহা মানুষের ধারণা ও কল্পনার বহির্ভূত। শক্তি জাগরিত হইলে শিবে স্পন্দন হয়। শক্তি যেমন একদিকে বিশ্বাত্মক আবার অন্যদিকে বিশ্বাতীত। ইহাই তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

শক্ ধাতু ভাববাচ্যে ক্তি প্রত্যয় করিয়া শক্তি পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। শক্ ধাতুর অর্থ শক্তি এবং শক্তি শব্দের অর্থও শক্তি। আমরা শক্তি শব্দের পূর্ব্বে অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহার খণ্ডরূপের ধারণা করি—যেমন ক্রিয়াশক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি। তথাপি ইহা এক এবং অভিন্ন। ইহা একই শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র। • চেতন এবং অচেতন সব পদার্থেই শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান, যদিও অচেতন পদার্থে স্থূলদৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়ে না। প্রতিটি কর্মের মধ্যে শক্তি অতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। সেখানে শক্তির পরিচয় পাই কার্য্যে। কোন একটি কার্য্য আপাতদৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলেও সমূলে বিনষ্ট হয় না। এইজন্য সেই শক্তি হইতে পুনরায় সেই কার্য্যের বিকাশ ঘটিতে পারে। মৃত পুরুষকে যোগিগণ পূর্ব্বদেহে সাময়িক-ভাবে দেখাইতে পারেন। দৃষ্টান্ত আছে মহাভারতে। 'আশ্রমিক পর্ব্বে, আশ্চর্য্য দর্শন' অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে মহারাজ জনমেজয়ের সংশয় উপস্থিত হইলে মহামুনি ব্যাসদেব যোগবলে মহারাজ পরীক্ষিতকে আবাহন করিয়া সাময়িকভাবে পূর্ব্বদেহে উপস্থিত করেন। বিনষ্টকার্য্যে শক্তির সূক্ষ্মভাবে অবস্থানের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন একটি বটবীজে ভবিষ্যতের বিশাল বটবৃক্ষ সুপ্তভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ সব কারণের মধ্যে তদনুকূল কার্য্য সূক্ষ্মভাবে সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি সুপ্তভাবে বিদ্যমান এবং ঘর্ষণের ফলে সেই সুপ্ত অগ্নির বহিঃপ্রকাশ হয়।

দুইটি বস্তু না হইলে শক্তি বুঝা যায় না—প্রথম শক্ত এবং দ্বিতীয় শক্য ; যাহাতে শক্তি আশ্রিত থাকে, তাহাকে শক্ত বলে ; আবার শক্তি হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাকে শক্য বলে। শক্ত এবং

শক্য স্থিরীকৃত না হইলে শক্তি নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাহা সূক্ষ্মরূপে শক্তি, তাহাই স্থূলরূপে শক্য। এক শক্তিই কারণ-রূপে অব্যক্ত এবং কার্য্যরূপে ব্যক্ত।

যিনি নিজের শক্তিকে চিনিয়াছেন বা জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই শুধু সত্যিকার জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশক্তির অধিকারী হইতে পারেন। আকাশমণ্ডলে যেমন প্রত্যেক গ্রহের কক্ষপথ নির্দ্দিষ্ট, যার ফলে একের সহিত অন্যের সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ মানুষের আত্মশক্তি বিকাশে প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘর্ষের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। সুতরাং সকলেরই আত্মশক্তি বিকাশে সচেষ্ট হওয়া উচিত। জীবাত্মা সাধনার দ্বারা জাগরিত হইলে পরাশান্তি লাভ হইবে। যার মধ্যে যে শক্তি আছে, চর্চ্চা বা সাধনা দ্বারা প্রস্ফুটিত হইলে, একে অন্যকে শ্রদ্ধা করিতে কোন বাধা থাকিবে না। ইহার বিপরীত অবস্থা হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ, সংশয় ইত্যাদি বৃদ্ধির সহায়ক বলিয়া সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

শক্তিতত্ত্ব একমাত্র তন্ত্রের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কারণ তন্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে শক্তি আমাদের কাছে মাটি, জল এবং আগুন হিসাবে সাকাররূপে এবং বাতাস ও আকাশ অবস্থায় নিরাকাররূপে প্রতিভাত হন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন—"**যিনি কালী, তিনিই ব্রহ্ম।**" সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"**কালী ব্রহ্ম, জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।**" যেমন জল ও তাহার তরলতা, দুধ ও তাহার ধবলত্ব, মণি ও তাহার জ্যোতিঃ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি অভেদ। গতিহীন এবং গতিশীল সর্প যেমন একই পদার্থ, তেমনি নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্ম এক। অগ্নি ও তাহার উত্তাপকে যেমন পৃথক করা যায় না, তদ্রূপ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

এই শক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ শিব-শিবার স্বরূপতত্ত্বের অনির্ব্বচনীয় ভাব উপলব্ধি করিয়া সাধক গাহিয়াছেন—"**ষড়দর্শনে পায় না তাঁরে, আগম নিগম তন্ত্রসারে।**"

সদ্‌গুরু ও দীক্ষা

তন্ত্রে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাথমিক জ্ঞান এবং তন্ত্র যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা।

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। কারণ তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র গুরুমুখেই লাভ করা যায়। তন্ত্র উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে গুরুকৃপা ব্যতিরেকে কোনকালে এবং কোন অবস্থায় এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় সৎশিষ্যই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র যোগ্য অধিকারী।

সদ্‌গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে অভীষ্ট লাভ (সিদ্ধি) দূরের কথা, ক্ষতির সম্ভাবনা সমধিক। কারণ, উপযুক্ত গুরু এবং প্রকৃত অধিকারী শিষ্য না হইলে শাস্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনক্রমে উপদেশ প্রদান এবং শিষ্য কর্ত্তৃক তাহা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ সম্ভব নহে।

তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবহৃত শ্লোক অনেকসময় সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত। এই কারণে ইহা সর্ব্বতোভাবেগুরুগম্য। ইহা ক্রিয়াক্রম-প্রণালী সমন্বিত মুক্তিশাস্ত্র। তন্ত্রের কৌলাচার দুরধিগম্য এবং দুরারোহ। উপযুক্ত শিষ্য সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। আবার তন্ত্রের অনেক শব্দ এবং শ্লোকার্থ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় লিখিত। সমর্থ সাধক ইহার গৌণ অর্থ বাদ দিয়া পারমার্থিক মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিবেন—ইহাও গুরুগম্য।

তন্ত্রের বীরভাবের সাধনা অতিশয় গুহ্য বলিয়া একান্তভাবে গুরুমুখী। তদন্যথায় ইহার সাধনরহস্য সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ ব্যভিচারের দিকে পা বাড়াইয়া থাকে। মনে হয় এই কারণে তন্ত্রের কঠিন শাসন—

"ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব।"

এই বিদ্যা কুলবধূর ন্যায় অতি গোপনীয়। এইসব কারণে গুরু হইতে উপদেশ নিয়া নির্জ্জনে সাধনা চালাইয়া যাইতে হয়।

মুক্তিসৌধের প্রথম সোপান দীক্ষা। কারণ, দীক্ষা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনায় কোন অধিকার জন্মে না।

তন্ত্রের মতে দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও নাই, সদ্‌গতিও নাই। এইসব কারণে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণক্রমে সাধনায় অগ্রসর হইতে তন্ত্রশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন।

দীক্ষা-রহস্য নিয়া আলোচনা অন্যত্র সন্নিবেশিত হইল।

যুগধর্ম্ম

আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া একটি কথা আছে। কারণ হিসাবে বলা হয় ইহা আশু ফলপ্রদ। সত্যযুগে 'তারকব্রহ্ম নাম' ছিল—

"নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ ॥"

আবার সত্যযুগের অন্তে ত্রেতা যুগের জন্য নূতন করিয়া তারক-ব্রহ্ম নাম প্রবর্ত্তিত হইল—

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

পুনরায় দ্বাপর যুগের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন তারকব্রহ্ম নাম ঘোষিত হইল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বৃষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

অবশেষে দ্বাপর যুগের অন্তে কলিযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারকব্রহ্ম নাম পরিবর্ত্তিত হইল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

শান্তি পাঠ

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"
ওঁ হ্রীঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মর্ম্মার্থ :—ঐ উর্দ্ধলোক (আমাদের অপ্রত্যক্ষ) এবং ইহলোক (আমাদের গোচরীভূত) পূর্ণ (ব্রহ্ম দ্বারা)। পূর্ণ (ব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ এই জগৎ উদ্গত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গৃহীত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

[পূর্ণ ব্রহ্ম দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও ব্রহ্মের পূর্ণতা সমানই থাকে।]

পূর্ণ শব্দের দুইটি অর্থ—একটি নিখাদ, অপরটি অমেয়। উভয় অর্থেই তিনি ব্রহ্ম। এই পূর্ণ সত্তা হইতে সর্ব্ব সত্তার উদ্ভূতি, সংস্থিতি এবং অন্তে তাহাতেই লয়। তিনি সব সময় সকলকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য পরম সত্তা।

তত্ত্বধী ও স্থিতধী ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিষ্ঠাকে ব্রহ্মের অভিমুখে সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্ম সদ্ভাব পর্য্যন্ত সকল স্তরেই ব্রহ্মনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। তাই বলা হয়—

"কেবলং ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ সঃ মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।"

অবশেষে আত্মোপলব্ধির দ্বারা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ ক্লেশ বা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা মন্ত্র।



আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

যোগমায়া

প্রাক্ কথন

'তন্ত্ররশ্মি' গ্রন্থ রচনার পটভূমিকায় সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য প্রথমেই পাঠকবর্গের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।

শিলঙের যোগমায়া আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী "যোগমায়া" নামে অভিহিতা। তত্ত্বতঃ ইনি সংযোগসাধিকা মহাশক্তি। তন্ত্রশাস্ত্র মতে 'মহাভাব' ও 'সাধনার' মূলে রহিয়াছে 'যোগ।' আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ঠাকুর সূর্য্যানন্দ মহারাজের পুণ্য স্মৃতি রক্ষাকল্পে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার ও বহুল প্রসারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই সঙ্কল্পের আংশিক রূপদান হিসাবে গুরুদেবের নামে 'Tantra Philosophy and Practice' সংক্রান্ত গবেষণা চালাইবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী আমাদের প্রেরিত একটি 'Fellowship' স্থাপনের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তন্ত্রশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় উপযুক্ত গবেষক পাওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়া উক্ত 'Fellowship' স্থাপনের প্রস্তাব সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে তন্ত্রের অধ্যয়ন অন্তর্গত করার মানসে ভারতের প্রায় একশত 'Non-technical' বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর কাছে আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। এইসব প্রচেষ্টায় আশাপ্রদ ফল না পাওয়ায় সমগ্র বিষয়টি ভারতের তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর গোচরে আনা হয়। ইন্দিরাজী সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটি বিবেচনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে পাঠাইয়া দেন। সেখান হইতে সমস্ত কাগজ-পত্র বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দপ্তরে পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উক্ত কমিশন (U. G. C.) হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

তন্ত্রের বিরাট অবদান প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার প্রভাব লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেই সুমহান্ ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

তন্ত্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাধন-শাস্ত্র। কিছু লোক তন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগ দেওয়ায় জনসাধারণের মনে একটি ভ্রান্ত ও বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। ইহার অবসান অত্যাবশ্যক।

বহুদিন যাবৎ আমি মহান্ তন্ত্রশাস্ত্রের যথাযথ প্রচারের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তন্ত্রবিষয়ক নানা আলোচনার মাঝে মাঝে বলিতেন 'note' করো; কিন্তু সময়াভাবে তাঁহার সকল বক্তব্য লিখিতভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই বলিয়া আজ অনুতপ্ত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি—যাহাতে পাঠকবৃন্দ তন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে পারেন। তন্ত্র বাস্তবধর্ম্মী। মন্ত্রযুক্ত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সাহায্যে তন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবরূপদান সম্ভব। এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থে তন্ত্রের মন্ত্রাংশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নাই বলিয়া দুঃখিত।

বাংলা ভাষায় বর্ত্তমানে বানানের নানা পদ্ধতি প্রচলিত। এই গ্রন্থে কোন একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ না করিয়া, বিভিন্ন অভিধান বিশেষ করিয়া শ্রীরাজশেখর বসু সঙ্কলিত 'চলন্তিকা' ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অবলম্বনে এবং প্রয়োজনমত নানা চলিত কথার সাহায্যে আমার বক্তব্য পাঠকদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছি।

প্রেমিক-পুরুষ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ সানন্দে গ্রন্থের এক সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। দশের সেবায় আত্মনিয়োজিত এই মহান্ আধারের দীর্ঘজীবন লাভের প্রার্থনা জানাই পরমপিতার শ্রীচরণে।

পূজ্যপাদ ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহোদয় গত কয়েক বৎসর যোগমায়া আশ্রমের প্রস্তাবিত তন্ত্রসম্বন্ধীয় কর্ম্মসূচীর রূপায়ণে প্রেরণা দিয়াছেন। 'তন্ত্ররশ্মির' আবির্ভাব তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হওয়ায় আমি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীভগবান তাঁহাকে কলিযুগের পূর্ণায়ু প্রদান করুন—ইহাই একান্ত কামনা।

গ্রন্থ রচনায় আমি অনেকের কাছে ঋণী। আমাদের প্রবীণ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক অবস্থা হইতে আমার এই ব্রত উদ্‌যাপনে উৎসাহ দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি

তন্ত্রশাস্ত্রকে জনপ্রিয় করিবার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। আমার সহপাঠী শ্রীকৃপেশ ভট্টাচার্য্য গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কল্যাণীয়া কুমারী সন্ধ্যা চৌধুরী পাণ্ডুলিপি রচনায়, শ্রীরূপেন্দু চৌধুরী গ্রন্থে পরিবেশিত ছবিগুলির ব্যবস্থাপনায়, শ্রীরাধানাথ সাঁতরা ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দ মুদ্রণে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমার পরম স্নেহাস্পদ ডঃ সরোজ বসু গ্রন্থ প্রকাশে সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে তাহার অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আমার যে সব গুরুভাইবোন আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিয়া এই সীমিত গুরুসেবায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

'তন্ত্ররশ্মি' শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার কৃপার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই গ্রন্থের হিন্দী ও ইংরেজী সংস্করণ অদূরভবিষ্যতে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সেই প্রচেষ্টা রূপায়িত হউক—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে সন্তানের নিবেদন।

যাঁহার সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ও নিরন্তর উৎসাহ দানে এই গ্রন্থ প্রণয়ন আজ সম্ভব হইল, সেই আশ্রম-জননী, মদীয় গুরুপত্নী, মা নিবেদিতা দেবীর চরণ-যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। আর আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগমায়ার চরণাম্বুজে জানাই সন্তানের প্রার্থনা—প্রতিটি পদক্ষেপে আমি যেন 'যোগ' হইতে বঞ্চিত না হই।

"যো হি মা সো হি গুরু,
যো হি গুরু সো হি মা,
জয় গুরু, জয় মা,
জয় জয় জয় মা।"

নিবেদক,
আশুতোষ চৌধুরী

স্বীকৃতি

'তন্ত্ররশ্মি' প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত গ্রন্থকারদিগের লেখনী প্রসূত তথ্যাদি হইতে আমি নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের রচনা হইতে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশেষ বিশেষ অংশ এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সেইসব মহাত্মা ও পণ্ডিতপ্রবরদিগের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, শ্রীশ্রী স্বামী নির্ম্মলানন্দ, মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ডি, লিট, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, Sir John Woodroffe, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন, পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি, শ্রীসত্যবান, শ্রীঅমলেশ মজুমদার, শ্রীভূপতি রঞ্জন দাস, শ্রীঅমূল্য নাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি।

তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভে 'তন্ত্ররশ্মি' লেখার উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হউক।

বিনীত

গ্রন্থকার



যোগমায়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা

ঠাকুর সূর্য্যানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর সূর্য্যানন্দ মহারাজের একখানি পত্র।

মৌলবী বাজার আশ্রম
১৯-১০-৪৩ ইং

ভগবদ্ভক্তেষু,

······গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কিসে হয়, তাই নীচে লিখিতেছি।

ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য কর্ম্ম-যোগ, ভক্তি-যোগ, জ্ঞান-যোগ, রাজ-যোগ, হঠ-যোগ, লয়-যোগ—কত না সাধন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত শিষ্যের পক্ষে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত যোগ এক আত্মসমর্পণ যোগে কেন্দ্রীভূত হয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় সদ্‌গুরুর চরণে আপনাকে অহরহ ডুবাইয়া, মিশাইয়া দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা শিষ্যের সাধনা।

১। সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্যকে বিচার করিয়া কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবার প্রয়াস করিতে হয় না। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশে তাঁহার অভীপ্সিত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার আনন্দবিধান করাই শিষ্যের '**কর্ম্ম-যোগ**'।

২। সদ্‌গুরুর পূজার্চ্চনা, ধ্যানধারণা, সেবাশুশ্রূষা ইত্যাদি উপায়ে, ভাবে, প্রেমে, অনুরাগে তন্ময় হইয়া থাকাই শিষ্যের '**ভক্তি-যোগ**'।

৩। সদ্‌গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠাবশে সমগ্র চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ, নিশ্চল হইয়া তাঁহার ভাবে, স্মৃতিতে ভরপুর থাকাই শিষ্যের '**রাজ-যোগ**' সাধনা।

৪। সদ্‌গুরুগত প্রাণ হইয়া 'সদ্‌গুরু ছাড়া আমার পৃথক অস্তিত্ব নাই; আমার অস্তিত্ব, আমিত্ব এবং অহংজ্ঞান সদ্‌গুরুর বিরাট

অস্তিত্বে ও আমিত্বে ডুবিয়া, মিশিয়া এক হইয়া যাউক'—এই ভাবনা ও ধ্যানই শিষ্যের **'লয়-যোগের'** সাধনা।

৫। ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, অব্যভিচারিণী ভক্তি ও প্রবল অনুরাগ প্রভাবে সদ্‌গুরুর মহাভাবে অনুক্ষণ আত্মহারা হইয়া থাকাই শিষ্যের **'সমাধি'**।

হঠাৎ বহুদিন পর আমার একটা পুরাতন গান মনে পড়িল—

"যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥
যদি কোনো দিন তোমারি আসনে আর-কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥"

সদ্‌গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ শুধু একজন্মের নয়; সদ্‌গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ অনন্ত জন্মের। অজ্ঞান-বিমোহিত শিষ্য জানে না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী সদ্‌গুরু তাহা জানেন এবং শুভক্ষণে, শুভসুযোগে শিষ্যকে স্বীয় চরণকমলে আকর্ষণ করেন। তাই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিষ্য অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥" (গীতা ৪।৫)

"অর্জুন! তোমার ও আমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে; অজ্ঞান বিমূঢ় তুমি তাহা জান না, আমি সব জানি।" স্নেহের পুতলি তনয়ের পশ্চাতে সন্তান-বৎসলা জননীর ন্যায় সদ্‌গুরু যুগে যুগে জন্ম-জন্মান্তরের শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তাইতো সাধন-সম্বলবিহীন অভাগা জীবের এত আশা ভরসা।

"যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।" (গীতা ২।৪৬)

সমগ্র জগৎ জলে জলময় হইয়া গেলে যেমন কূপ-জলের আবশ্যক থাকে না, তেমনি সদ্‌গুরুর কৃপায় যে শিষ্য আত্মজ্ঞানের সাধনায় দীক্ষালাভ করিয়াছে, সমস্ত বেদ বেদান্তে তার কোন আবশ্যকতা নাই। একমাত্র সদ্‌গুরু কৃপাই তার যথা সর্ব্বস্ব। হঠাৎ অযাচিত-ভাবে আর একটি গান মনে এল। ওটাও তোদের নিকট পাঠালুম।

"তোমারই আশ্রিত পিতঃ তোমারই সন্তান,
তোমারই চরণ ভিন্ন নাহি গতি আন।
ব্যথায় পীড়িত হলে ভাসি যবে আঁখিজলে,
মধুর হাসিয়া কর অভয় প্রদান।
সংশয় তিমির মাঝে তব ধ্রুব জ্যোতি রাজে,
আলোকিয়া দশদিক পুলকে এ প্রাণ।
জনকের সুশাসনে জননীর স্নেহদানে,
চিন্ময় সদ্‌গুরুরূপে কর জ্ঞান দান।
সখারূপে হেসে চাও, বন্ধু বলে কোলে নাও,
পরমাত্মা রূপে সদা হৃদে অধিষ্ঠান।"

অনেক সময় তোদের থাকিতে পারে আশা—স্বাভাবিক। অনন্ত জন্মের অনন্ত পাপরাশি কিরূপে বর্ত্তমান জন্মের সামান্য সাধনের দ্বারা ক্ষয় হইবে? কিন্তু স্মরণ করিতে হইবে সামান্য অগ্নিকণা বিরাট ইন্ধনের স্তূপের মধ্যে স্থাপিত ইলে যেমন অলক্ষিতে ধীরে ধীরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া অনতিকাল মধ্যে সমগ্র ইন্ধন দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি সদ্‌গুরু প্রদত্ত শক্তি ও সাধন অনুষ্ঠিত হইলে তদ্বারা অনন্ত জন্মের প্রাক্তন কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়। সহস্র বৎসরের অন্ধকার একটি আলোক-শিখার স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় তাঁহার শক্তি ও সাধন যথারীতি অনুষ্ঠান করার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ ও জ্ঞান প্রকাশ হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের যাবতীয় দুষ্কৃতি ও অশুভ সংস্কার দূরীভূত হইতে থাকে। সুতরাং একান্ত নির্ভরচিত্তে ধৈর্য্য সহকারে সদ্‌গুরু প্রদত্ত সাধন যথারীতি অনুষ্ঠান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। নানা বাধাবিঘ্ন প্রভাবে

কখনও কখনও যথারীতি অনুষ্ঠানে অক্ষম হইলেই, 'উহা করিয়া আর কি হইবে' মনে করিয়া ছাড়িয়া দিও না। একান্ত কাতরচিত্তে অনুতপ্তহৃদয়ে সদ্‌গুরু চরণে অপরাধ নিবেদন করিয়া শক্তি ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করিলে ক্রমে ক্রমে সাধন-ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে। সদ্‌গুরু প্রদত্ত সাধন যে যতটুকু অনুষ্ঠান করিবে, সে ততটুকু ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিবে। তাইতো রে ভাবি তোদের এমন দিন কবে হবে।

'সদ্‌গুরুর সাহায্যে সাংসারিক সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-সাধন করিয়া লইব'—এরূপ ভাব লইয়া সদ্‌গুরুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব। ধর্ম্মজীবন ও আত্মজ্ঞান লাভের এবং আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য, ইন্দ্রিয়-কলুষ-কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, পাপ তাপের জ্বালা-মালা শান্তির জন্য ব্যাকুলভাবে সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার সহিত এক পবিত্র প্রেম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এরূপ নিঃস্বার্থ অনুরাগী প্রেমিক ভক্ত বা শিষ্য দূরে বা নিকটে যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সদ্‌গুরুর সহিত তাহার পিতামাতা, স্বামী, সখার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেম সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া সদ্‌গুরুর মহাভাবে তাহাকে ডুবাইয়া রাখে।

'সদ্‌গুরুর মহাভাবে সমাহিত হওয়াই সিদ্ধি।'

সদ্‌গুরুর সহিত শিষ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি, অনুরাগের সম্বন্ধ যতই গাঢ়তর হইতে থাকে—বুঝিতে হইবে শিষ্যের সাধনা ততই পরিপক্কতা লাভ করিতেছে। শিষ্য ধীরে ধীরে যতই আপনাকে সদ্‌গুরুর চরণে বিকাইয়া দিতে থাকে, সদ্‌গুরুও ততই তাহাকে তাঁহার অপার অহেতুক স্নেহ ভালবাসা দ্বারা আত্মহারা করিয়া তুলিতে থাকেন।

এইরূপ অগ্রসর হইতে হইতে শিষ্য এমন অবস্থায় একদিন পৌঁছায়, যখন শিষ্য দেখে তার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তাহার দেহ, মন, বুদ্ধি, ইচ্ছা, বাক্য, কার্য্য—সমস্তই শ্রীগুরুতে বিলীন হইয়াছে। তখন সে চিরকালের তরে সদ্‌গুরুতে ডুবিয়া, মজিয়া,

সমাহিত হইয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। তখনই শিষ্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। তাই সাধক বলিয়াছেন—**'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'** এইখানে শিষ্যের অদ্বৈতজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ বোধ হয়। তাই সদাশিব গুরুর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান-মূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণম্॥"

ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম ও পরম সিদ্ধি। তাই গুরু শঙ্কর প্রশ্নোত্তরছলে বলিয়াছেন—

"সিদ্ধস্তু কো যো গুরু ভক্ত এব"

কোন ব্যক্তি সিদ্ধ? যে ব্যক্তি গুরুভক্ত তাহাকেই প্রকৃত সিদ্ধ বলা হয়। মাতাপিতা যেমন শিশু সন্তানকে স্নেহ করিয়া, ভালবাসিয়া সুখী, কোন কিছু প্রত্যাশা করেন না, তেমনি সদ্‌গুরুকে নিঃস্বার্থভাবে কোনও প্রতিদানের আশা না করিয়া ভালবাসিতে পারিলেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ লাভ হইবে। সদ্‌গুরুর স্নেহ-প্রেম শিষ্যকে মহাভাবে ডুবাইয়া রাখিবে। শুধু তাঁর কৃপা লাভের জন্য, তাঁর তুষ্টি, তৃপ্তি, সুখ-শান্তি, আনন্দ বিধানের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসিবে, সেবা-শুশ্রূষা ও আদেশ পালন করিবে।

"ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান।
'দাও দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।"

এসো, আজ এই মহাযুগের মহাপ্রভাতে নরদেহধারী সদ্‌গুরু-রূপী শ্রীভগবানের চরণতলে লুটাইয়া প্রাণের বেদনার রঙে রাঙাইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করি—

"গুরু নারায়ণ আশিস্ বর্ষণ
কর তব দীন দুর্ব্বল সন্তানে।

মোদের তুমি বিনে কে আছে ভুবনে
নাশিতে অজ্ঞানে যোগ-জ্ঞান দানে॥
পাপের কুমন্ত্রণা যেন নাহি জাগে
এই ভিক্ষা প্রভু মাগি হে শ্রীপদে।
থেকে মোদের হৃদে রেখো নিরাপদে
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে॥
হয়ে নিত্য-নির্ব্বিকার নিগুর্ণ অক্ষয়
অশব্দমস্পর্শম্ অরূপমব্যয়ম্॥
করে দেহাশ্রয় জন্ম-মৃত্যু ক্ষয়
করিতেছ নাথ তত্ত্ব-জ্ঞান দানে॥
ভবারাধ্য ধন ও রাঙ্গা চরণ
মোহে মগ্ন হয়ে চিনি নাই কখন।
করি নিবেদন, যেন মোদের মন
সদা সর্ব্বক্ষণ রহে ও চরণে॥
তোমারি আদেশ সদা শিরে ধরি
সাধন-পথেতে বিচরণ করি।
দিতে যেন পারি ভব-নদী পাড়ি
ডুবি নাহি যেন এ মোহ জীবনে॥
কত জনম ব্যাপিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
সকলে মিলেছি চরণে আসিয়ে।
তোমারে হেরিয়ে জুড়াইব হিয়ে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ও রাঙ্গা চরণে॥"

ওঁ শান্তিঃ।

আমার এ পত্রখানা তুমি এবং তোমার অন্যান্য গুরুভ্রাতারা মিলিয়া পাঠ করিও। সাহচর্য্য কালে সব সময়ে উপদেশ দেওয়া হয় না। তাই যখনকার যাহা প্রয়োজন লেখনী সংযোগে গুরুদেবের প্রয়োজন বোধ মিটান। গানগুলি স্তোত্রের মতো করিতে পার।

ইতি—
তোমাদের হৃদয়ানন্দ
গুরুদেব

ভূমিকা

জয় জগদ্বন্ধু হরি

শিলঙের যোগমায়া আশ্রমের আশ্রম-জননী আমার কাছে পুত্র-স্নেহে আবদার করিয়াছিলেন একখানি তন্ত্রের গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আমি লিখিয়া দিব—তিনি তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব ও স্বামী তন্ত্রাচার্য্য শ্রীসূর্য্যানন্দ মহারাজের স্মরণে উৎসর্গ করিবেন। তাঁহার এই আবদারে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম—কিন্তু তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারিলাম না নিজ অসুস্থতার জন্য।



ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

কয়েকদিন তন্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতাম। বৈষ্ণবীয় পথে নিজ ভজন সাধন, কোন পথ দিয়া তন্ত্রে প্রবেশ করিব। একদিন একটা অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইল। অভিজ্ঞতার কাহিনী মাকে পাঠ করিয়া শুনাইলাম। মায়ের আনন্দ ধরে না। কিন্তু একই সময় কালা-কালীর কৃপা পাইয়াও লেখা আর অগ্রসর হইল না। যোগ্যতর হাতে লিখাইবেন বোধ হয় এই জন্যই।

মায়ের এক যোগ্য সন্তান শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় মায়ের আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমাকে ভূমিকা লিখিতে বলিলেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম এত সুন্দর গ্রন্থ আমি লিখিতে

পারিতাম না। 'তন্ত্র রশ্মি' সত্য সত্যই তন্ত্রজ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মি ছড়াইতেছে।

আমাকে ভূমিকা লিখিতে মা অনুরোধ করিলেন। মনে করিলাম মায়ের স্নেহের আবদার রক্ষা করিতে না পারিয়া যে একটা অপরাধের বোধ অন্তরে জাগ্রত তাহার কথঞ্চিৎ অপনোদন হইয়া যাইবে।

লিখিতে বসিয়া মনে হইল—যে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা মাকে শুনাইয়াছিলাম তাহাই গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে থাকুক। তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সেদিন কালী পূজা। এক ভক্তগৃহে আমি আছি অসুস্থ দেহে বিশ্রামে। পার্শ্ববর্ত্তী আর এক ভক্তগৃহে কালী পূজা। তাহাদের আত্যন্তিক আগ্রহে আমি অসুস্থ দেহেও মায়ের পূজা দর্শন করিতে যাই। রাত তখন গভীর। দ্বিতীয় যাম গত।

আমি বৈষ্ণব। আমার আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণ মিলিত অঙ্গ গৌরাঙ্গ। অন্তরে এই ধ্যান লইয়াই কালী পূজা দর্শন করিতে লাগিলাম। দর্শন করিতে করিতে কেমন যেন হইয়া গেলাম। একটি লীলা প্রত্যক্ষ হইল—অভূতপূর্ব, অবিচিন্ত্যপূর্ব।

দেখিলাম শ্রীরাধা-গোবিন্দ গাঢ় আলিঙ্গনে মিলিয়া যাইতেছেন। মিলিতে মিলিতে শ্যাম, শ্যামা হইয়া গেলেন। বাহিরে রাধা অন্তরে কৃষ্ণ হইলে, হইতেন গৌরাঙ্গ। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহা বিপরীত। রহিলেন বাহিরে কৃষ্ণ—অন্তরে গেলেন রাধা। বর্ণটি কৃষ্ণের। আকৃতিটি রাধার।

বর্ণ, গায়ের রঙ। আকৃতি, অঙ্গের গঠন, চেহারা। যখন গৌর হন, তখন যিনি বাহিরে তাঁহার বর্ণ অর্থাৎ রাধার বর্ণ। যিনি অন্তরে তাঁহার আকৃতি, অর্থাৎ কৃষ্ণের আকৃতি পুরুষ রূপ। দুই মিলিয়া "কালী" হইবার কালেও তাহাই হইল। যিনি বাহিরে তাঁহার বর্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণের বর্ণ কালো। আর যিনি অন্তরে, তাঁহার আকৃতি অর্থাৎ রাধার আকৃতি—প্রকৃতিরূপা।

কালীর মূর্ত্তিতে নিজ আরাধ্য দেবতার নূতন রূপ দর্শন করিয়া কী যে আনন্দ হইল তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনীয় নহে। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ ভাগবত সম্পর্কে গৌতমীয় তন্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ

যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।

আমার মনে হইতে লাগিল—

যো গৌরঃ সৈব কালী স্যাৎ

যা কালী গৌর এব সঃ।

মনে হইল নৃসিংহ-তাপনী উপনিষদে ঐরূপ একটি নজির আছে—

যো বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্

যা চ সরস্বতী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।

বৈদিক ও তান্ত্রিক ধারায় এই একত্বের দৃষ্টান্ত আর কোথায় কোথায় আছে ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল মুণ্ডক উপনিষদে—"কালী করালী"—এই কথা আছে। কেন উপনিষদে—উমা হৈমবতীর কথা আছে।

বেদে দেবীসুক্ত আছে। "সপ্তশতী-চণ্ডী" তো তারই ভাষ্য। বেদে শ্রীসুক্ত আছে। মাত্র একটী মন্ত্র মনে পড়িল—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণ বহত প্রজ্যাম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥

"জাতবেদা" তো অগ্নি। অগ্নিই তবে লক্ষ্মী।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—"যে যে দেবতাকে ভজনা করে, সে আমাকেই ভজনা করে।" চণ্ডীতে মাকে স্তুতি করিয়া দেবতারা বলিয়াছেন নিখিল দেবগণ শক্তি সমূহ মূর্ত্ত্যা। কৃষ্ণ বলেন, "ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।" (রাজযোগ ৯।৪)। চণ্ডীতে মায়ের কথা—"নিত্যৈব সা জগন্মুক্তির্ষয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

শ্রুতি বলিয়াছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

চণ্ডী বলিয়াছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" (১০।৪)

শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন, দুর্গা আর কৃষ্ণ একই। ঘটের মধ্যে

জল। আর জলের মধ্যে ঘট। রাধার অন্তরে কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের অন্তরে রাধা। জল ভরা ঘট যদি সাগরে ডুবাই, তাহা হইলে একই সময়ে জলের মধ্যে ঘট, ঘটের মধ্যে জল।

মনে হইল আমার আরাধ্য শ্রীহরিপুরুষ সাগরের মধ্যে। কৃষ্ণের মধ্যে রাধা—কালী। রাধার মধ্যে কৃষ্ণ—গৌরহরি। মনে পড়িল বঙ্কুহরির গানটি।

"এস মা পাগলা কালী লয়ে প্রেমের ডালি।" ভাবিতাম যাঁহার হাতে নরকপালে রক্ত—তিনি প্রেমের ডালি কোথায় পাবেন? আজ যেন বুঝিলাম কালী মা প্রেমের ডালি কোথায় পাবেন। বুঝিলাম গোপীগণের প্রার্থনার মন্ত্র—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।

অভিন্ন বস্তু। তাই বলিয়াছেন—তুমি তোমাকে আমাদের দাও। কালীমাতার দর্শন করিয়া একটি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ লইয়া গৃহে ফিরিলাম। ফিরিয়া অসুস্থ দেহে শয্যায় শয়ন করিলে "তন্ত্র" সম্বন্ধে কিছু লিখিতে একটি প্রেরণা আসিল। হাতের কাছে কোন গ্রন্থ নাই। তবুও লেখার জন্য একটি আবেগ বেগবান্ হইয়া উঠিল। মনে হইল—

গঙ্গা-যমুনার মিলনভূমি যেমন প্রয়াগধাম তীর্থরাজ, তেমনি বৈদিক-তান্ত্রিক দুই সাধন ধারার মিশ্রণে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।

"অদ্বৈতবাদের" আচার্যশিরোমণি শঙ্কর। যিনি শারীরক ভাষ্য প্রণেতা, তিনিই "প্রপঞ্চসার-তন্ত্র" লিখিয়াছেন। তিনি আবার শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্র লিখিয়াছেন। চণ্ডীর চিদানন্দ কেলিবিলাস টীকা লিখিয়াছেন।

শ্রীদেবী স্বয়ং তো একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যেটি মন্ত্ররাজ, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা।

তাইতো শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

সেই জন্যই বুঝি স্বয়ং নিত্যানন্দ, গৌরহরির আদেশে গৌড় দেশে আসিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করতঃ শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করিয়া পার্শ্বে ত্রিপুরাসুন্দরীর আসন স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যখন পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন, তখন এক স্বামীহারা নারী প্রভুর চরণে নিবেদন করেন, তাঁহার পুত্রের জীবন যাত্রা কি করিয়া চলিবে? প্রভু স্বহস্তে একখানি চণ্ডী লিখিয়া ঐ বিধবার হাতে দিয়া বলেন—"ইহা দ্বারা চলিবে।"

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার গ্রন্থে ও তৎপর কবিরাজ গোস্বামিপাদ—"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" যে হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ প্রভৃতি শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সবই তন্ত্রের পরিভাষা।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কোন নূতন স্থানে গমন করিলে—সেইখানে কোন কালীবাড়ী পাইলে সেইখানেই অবস্থান করিতেন। পাবনা থাকাকালে প্রসিদ্ধ জয়কালী-মন্দিরেই আসন রাখিতেন। কখনও বুড়ো শিব হারাণ ক্ষেপার সঙ্গে থাকিয়া মা সিদ্ধেশ্বরীর আরতি দর্শন করিতেন।

ভাবিতে ভাবিতে ভোর হইয়া গেল। আমার নয়ন যেন—"নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ।"

যাহা দ্বারা সংসারের যাবতীয় কার্য সুশাসিত হয়, তাহা "শাস্ত্র"। কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য—যে নির্দেশ করিয়া দেয়, সেই শাস্ত্র।

তস্মাচ্ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে চারটি শাস্ত্র স্বীকৃত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। "বেদ" হইল "অপৌরুষেয়" বাক্য—"শ্রুতি", "স্মৃতি", মনু প্রভৃতি দ্রষ্টা ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র। "পুরাণ" বেদব্যাস কৃত অষ্টাদশ সংখ্যক গ্রন্থ। "তন্ত্র" পরম বস্তু লাভের জন্য বাস্তব সাধন।

বেদ—চারখানি। এজন্য অনেকে তন্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলেন। তন্ত্র হইতেছে শাস্ত্রের প্রাণ। বেদ হইতেছে শাস্ত্রের দেহ। স্মৃতি হইতেছে শাস্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়বর্গ। পুরাণ দেহের পোষাক-পরিচ্ছদ।

(কেহ বলেন সত্য যুগের শাস্ত্র বেদ। ত্রেতা যুগের শাস্ত্র স্মৃতি। দ্বাপর যুগের শাস্ত্র পুরাণ। কলি যুগের শাস্ত্র তন্ত্র)

তন্ ধাতু, ত্রন্ প্রত্যয়। তনু বিস্তারে। তন্ ধাতুর অর্থ—বিস্তারিত হওয়া। গীতায়, চণ্ডীতে ময়া ততমিদং সর্ব্বং—এই "ততম্"—তন্ ধাতু হইতে জাত।

যে শাস্ত্র জীবনকে বিস্তারিত করে সে তন্ত্র। বিপরীত ভাবে বলি—যে শাস্ত্র মানব জীবনকে ছোট করে না—ক্ষুদ্র করে না—হীন করে না। যেমন অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র মানুষকে ছোট করে, জীবনে হীনতা আনে। তন্ত্র শাস্ত্র তাহা করে না; কেবল বড়ই করে। বড় করিতে করিতে অসীম অনন্তের সঙ্গে একাকার করিয়া দেয়, তা তন্ত্র। "তন্যতে বিস্তৃয়তে জ্ঞানমনেনেতি তন্ত্রম্।" জ্ঞানকে বিশাল করিয়া ভূমার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়।

ত্রন্ প্রত্যয়ের অর্থ ত্রাণ করা। বাঁচাইয়া দেওয়া। "তন্ত্র" শব্দের অর্থ হইল, জীবনকে এমনভাবে বিস্তারিত করে যে ঐ পথের সাধক সকল দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভ করে—তারপর ভূমানন্দে সত্যিকার বাঁচা বাঁচিয়া থাকে।

তন্ত্র শাস্ত্র একটি বিশেষ প্রকারের ধর্ম্ম শাস্ত্র যাহার উদ্দেশ্য মানুষের অনুভূতিকে বিস্তার করিয়া—আত্মকেন্দ্রিকতা নাশ করিয়া—'বিশ্বকেন্দ্রিক' করিয়া তোলা। যাহার উদ্দেশ্য শুভ কর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজ অন্তর্নিহিত নিদ্রিত শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মানুষ যাহাতে শিবত্বে পৌঁছিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। মানুষ যাহাতে সসীমতা হইতে অসীমে চলিয়া গিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে।

বিন্ধ্যপর্ব্বতকে মধ্যস্থলে রাখিয়া ত্রিভুজাকার ভারতভূমিকে তিন ভাগ করা হইত। প্রাচীনকালে ভাগগুলির নাম ছিল অশ্বক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা ও রথক্রান্তা। এই তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগে চৌষট্টি-খানি করিয়া তন্ত্র বিদ্যমান ছিল। ৬৪ × ৩ = ১৯২ খানা তন্ত্র ছিল প্রত্যেকখানি তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী ছিল এক একজন যোগিনী। কাশীধামে (বারাণসী) এখন পর্যন্ত "চৌষট্টি যোগিনী ঘাট" বিরাজিত।

এই বিশাল ভূখণ্ড বা বৃহত্তর ভারতের তন্ত্রের ৫১টি তাহা এখনও পীঠস্থানে রূপে বিদ্যমান। এই একান্ন (৫১) পীঠের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল কামাখ্যা। কামাখ্যা তখন বৃহত্তর বঙ্গের মধ্যে স্থিত। তন্ত্র শাস্ত্রের বিদ্যাকে বলা হইত "গৌড়ীয়-বিদ্যা।" গৌড়দেশ বলিতে বৃহৎ-বঙ্গকে বুঝাইত। কতখানি ব্যাপক ছিল এই শাস্ত্রের প্রচার ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বেদ শাস্ত্রের তিন ভাগ। কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ও উপাসনা কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে সর্ব্ববিধ যাগযজ্ঞাদি। গৃহীর গৃহ-আশ্রম ছিল যাগ-যজ্ঞ পরিপূর্ণ।

জ্ঞানকাণ্ড, পরাজ্ঞানের কথা; জ্ঞানের সার, বেদান্তের কথা। ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, পরকালের তত্ত্ব—ইহা তাহার উপজীব্য।

উপাসনাকাণ্ড—কি উপায়ে চরমতম লক্ষ্য বস্তুকে লাভ করিতে হইবে—সেই সাধন ভজন, উপাসনার কথা।

উপাসনাকাণ্ড হইতেই তন্ত্রের প্রকাশ। তন্ত্র কখনও দেহকে উপেক্ষা করে নাই। দেহ ভাণ্ডেই সকল ব্রহ্মাণ্ড আছে ইহাই তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। দেহের মধ্য দিয়াই, দেহাতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, ইহাই তাহার প্রচেষ্টার মূল।

সুতরাং দেহকে সুস্থ রাখা তাহার একান্ত প্রয়োজন। দেহের সুস্থতার জন্য—"আয়ুর্ব্বেদ"। ভারতের বিশাল সুগভীর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, তন্ত্র আচার্য্যদের মহা অবদান।

বৈদিক সাধনার যাহা ভাবময় (Ideal) অংশ তাহাকে বাহ্যিক ক্রিয়াত্মকরূপে (Actualise) প্রকাশ করাই তন্ত্র শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি একটি বিরূপ মনোভাব প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ অনেকেরই মনের তলায় এই কথাটা আছে যে, তন্ত্র দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। তন্ত্র অশ্লীলতার সমর্থন করে। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে অভিচার ক্রিয়া, যাহা ভদ্রসমাজে ঘৃণাকারজনক। তন্ত্রের সাধনে লাগে পঞ্চ 'ম' কার। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। ইহা

কুৎসিত ও শ্লীলতাহানিজনক ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে বিদূরিত না হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করা কঠিন কার্য্য।

এইরূপ বিরূপ মনোভাবের মূল হেতু শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা। অশ্লীল পরিভাষা হিন্দু শাস্ত্রের প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এমন কি বৈষ্ণব শাস্ত্রেও বিদ্যমান। তন্ত্রে তো আছেই। পরিভাষাগুলির রহস্য সর্ব্বাগ্রে বুঝা দরকার। সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিলেও—পরিভাষাগুলি যে গভীর তত্ত্ববিজ্ঞাপক এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত বোধ থাকা দরকার।

কোণারকের সূর্য্য মন্দিরে, পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে ও আরও অনেক মন্দিরের গায়ে অশ্লীল চিত্র আছে। উহাদের মধ্যেও রহস্য আছে। না বুঝিয়া বিরূপ সমালোচনা অশোভন। শ্লীলতা, অশ্লীলতা কথাগুলিও বিশেষ কোন অর্থবহ নহে। দেহের দুটি অঙ্গের আলোচনাই অশ্লীল—লিঙ্গ, যোনি—শুনিলেই ভদ্রসজ্জন চমকিয়া উঠেন, বা নাসিকা কুঞ্চন করেন। কিন্তু ইহা বুঝা উচিত, একজন ডাক্তারের কাছে ঐ দুটি অঙ্গই সর্ব্বাধিক আলোচ্য বস্তু। কারণ সকল সৃষ্টির রহস্য ঐ অঙ্গে লুক্কায়িত। দেহের মল, মূত্র, কফ, আপনার কাছে অপবিত্র। কিন্তু একজন ডাক্তার ঐগুলি শিশিতে ভরিয়া লইয়া যায় পরীক্ষার জন্য। কারণ ঐগুলির মধ্যে রোগীর দেহের তথ্য বিদ্যমান আছে। সুতরাং শ্লীল, অশ্লীল কথা নির্ভর করে দৃষ্টি ভঙ্গীর উপর। শাস্ত্রের দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। বেদে আছে উর্ব্বশী পুরূরবার কথা। কাহিনীতে আছে, পুরূরবা প্রতিদিন তিনবার—সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় উর্ব্বশীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেন। এই পরিভাষার অন্তর্নিহিত কথা হইল—পুরূরবা একজন ঋষি—যিনি উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করেন। তিনি অগ্নির ত্রিবিধ হবনের প্রবর্ত্তক। উর্ব্বশী—অর্থ অগ্নি। অগ্নির প্রাতঃ সবন, মধ্যাহ্ন সবন ও সায়ং সবন ঋষি পুরূরবার প্রবর্ত্তন। ইহাই পুরূরবার ক্রীড়া।

উপনিষদে আছে নরনারীর মিলন-প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণন। উহাও রহস্যাবৃত। উপনিষদে আছে সোহকাময়ত। তিনি কামনা

করিলেন। উপনিষদে স্ত্রী পুরুষের সম্পরিষ্বক্ত অবস্থার দৃষ্টান্ত আছে।

বেদান্ত দর্শনে সূত্র আছে—শাস্ত্র যোনিত্বাৎ। সূত্র আছে যোনেঃ। বৈষ্ণব সাহিত্যে—গীতগোবিন্দ গ্রন্থ ঐ জাতীয় কথায় ভরা। উহা যে অতি উচ্চস্তরের মহামিলনের সংবাদ ইহা বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। একটি ভাবের নাম ব্যভিচারী ভাব। রাধা গোবিন্দের নিবিড় মিলন বিরহের অবস্থার নাম মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কামবীজ, কাম গায়ত্রী। এই পরিভাষাগুলি আপাত কানে লাগিলেও উহা যে পরম গভীর রসতত্ত্বের মহামাধুর্য্য বিজ্ঞাপক—এই অনুভব থাকা প্রয়োজন। না থাকিলে শাস্ত্রপাঠ ব্যর্থ হইবে। কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ বেশী হইবে।

অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও যে কথা, তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। অভিচার—অভি পূর্বক চর ধাতু। অভি অর্থ অভিমুখে। চর ধাতুর অর্থ বিচরণ করা। চরৈবেতি। চলিতে চলিতে অগ্রসর হও। আরাধ্য বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হও—ইহাই অভিচার কথার তাৎপর্য। মারণ অর্থ বধ করিয়া ফেলা। ক্ষুদ্র আমিত্বকে নিঃশেষে মারিয়া ফেলিতে পারিলেই বৃহৎ আমিত্ব জাগিবে। কাঁচা আমি না মরিলে পাকা আমি জাগ্রত হয় না।

উচ্চাটন অর্থ ঊর্ধ্বদিকে টানিয়া লওয়া। অট ধাতুর অর্থও বিচরণ করা। ক্ষুদ্র আমিত্ব মরিলেই জাগে শরণাগতি। শরণাগতি আসিলেই ঊর্ধ্বে উঠা যায়।

মোহন অর্থ মুগ্ধতা। আরাধ্য বস্তুর রূপে গুণে—চিত্তের বিমোহন।

স্তম্ভন অর্থ অচল হইয়া যাওয়া। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের একটি আছে স্তম্ভ দশা। স্তম্ভন অর্থে মনকে দৃঢ়ভাবে ইষ্টে লাগাইয়া রাখা। কোন কিছুতেই বিচলিত না হওয়া।

বশীকরণ—ভক্ত ভক্তি দ্বারা ভগবানকে এমন আপন করেন যে ভগবান তার কাছে বশীভূত হইয়া যান। নিজেই বলেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার

অধীন। ভগবানকে বশীকরণ, পূর্ণভাবে আপনজন করিয়া লওয়া। ভক্ত অধীনতা ভগবানের শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্য। এসব সাধকের সাধনভূমির কথা। হীনভূমি হইতে ইহাদের কু ব্যাখ্যা অবাঞ্ছিত। তন্ত্রের "ম" কার গুলির কথা বলিতে হইল—তন্ত্র শাস্ত্র যে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে তাহা জানিয়া লওয়া দরকার।

তন্ত্রশাস্ত্র মানব-সমূহকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। পশুভাব বিশিষ্ট, বীরভাব বিশিষ্ট ও দিব্যভাব বিশিষ্ট। (যাহারা পাশবদ্ধ তাহারাই পশু। আটটি পাশ। অজ্ঞতা, মোহ, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, কুলশীল বর্ণ—এই সকল পাশবদ্ধ যারা তাহারা পশু।)

তন্ত্রের ভাষায় আমরা সকলেই পশু। পশুর তমোগুণ প্রধান। তার উপর ক্রিয়া করে "রজোগুণ"। সর্ব্বদা ভুল ভ্রান্তি, তন্দ্রা, আলস্য, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থান্ধতা, পরশ্রীকাতরতা এই সকল "পশু মানুষের" স্বভাবগত।

পশুর তিনটি কাজ, আহার, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি। পূজা-অর্চ্চনা, মন্ত্র, তন্ত্র, কিছুরই ধার ধারে না। যজ্ঞ বা জপের কোন ফল আছে বিশ্বাস করে না। মন্ত্রকে মনে করে অক্ষর মাত্র। বিগ্রহকে মনে করে পাথর মাত্র। গুরুকে মনে করে মানুষ মাত্র। নিজেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সেই সংস্কারের চশমায় জগতের যাহা কিছু সুন্দর শুভ সংস্কার সেগুলিকে মলিন দেখে। তাহার এই বন্ধনও মায়ের ইচ্ছায়। বন্ধন শূন্য "পশু মানুষের" সাধনার প্রথম শিক্ষাই হইল— "ম" কার গুলি ত্যাগ। কঠোরভাবে আদেশ আছে তন্ত্রশাস্ত্রে মৎস্য, মাংস, মদ্যপানের। এমন কি নিজ সহধর্মিণীসহ জীবন-যাপনেরও কঠোর নিয়ম আছে। তাহার ব্যতিক্রমে সাধন ব্যাহত হইবে।

বীরভাব-বিশিষ্ট মানুষ জন্মে পূর্ব্ব জন্মের সাধন বলে। বীর ভাবের মানুষ সত্ত্বগুণী। তার উপর ক্রিয়া করে রজোগুণ। সে তপস্বী ঊর্ধ্বরেতা। সকল কার্য্যেই বীরত্বভাব, উদ্ধত ভাব, তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য নাই। মদপান যদি করে তবে মদের মত্ততা তাহাকে ভজনে মত্ততা আনিয়া দেয়। বীরাচারী সাধক গুরু নির্দ্দেশে চলে।

নির্জ্জনে, বনে, শ্মশানে, অমাবস্যায় গভীর রাত্রে সে সাধনা করে, মৃত শবের উপর আসন বদ্ধ হইয়া জপ-তপ করে। শ্রুত আছে মেহারের সর্ব্বানন্দ এক রাত্র সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মা কালীর দর্শন পাইয়াছিলেন। বামাক্ষেপা বীর সাধক ছিলেন।

দিব্যভাবের সাধক সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থিত। তার ভিত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ। তাহার উপর ক্রিয়া করে মলিন সত্ত্ব। সে আচারবান, সন্ধ্যা-আহ্নিক ক্রিয়াবাণ, তিলক, তর্পণ, পিতৃকার্যনিষ্ঠ, ধীর, শান্ত, বিনয়ী, উদ্ধত ভাবের নাম-গন্ধ নাই। সে শাস্ত্রনিষ্ঠ, গুরুনিষ্ঠ, পূজাঅর্চ্চনা মগ্ন।

এই দিব্যগুণের সাধক পঞ্চ "ম" কারকে কি দৃষ্টিতে দেখেন তাহা বলিতেছি—

যাহা মাদকতা আনে তাহা মদ। ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—মোহ ইষ্টলাভ বিনে; মদ কৃষ্ণ গুণ গানে। কৃষ্ণ গুণ গান গাহিয়া উন্মাদ হইয়া যাইব। ভাগবত বলিয়াছেন—

জাতানুরাগ দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ
উন্মাদবৎ নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ।

আরাধ্য বস্তুর প্রতি চিত্তের যাহা প্রমোদন আনে তাহার নাম 'মদ্য'। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" সাধক হইলেই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রমোদন সম্ভব। "সান্ত রসের" ভক্তই মদ্য সাধক।

মাংস সাধন। শিব পার্বতীকে বলিতেছেন—

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক॥

'মা' শব্দ রসনা। তাহার অংশ রস। রসকে যে চিবাইয়া খায় সে মাংস সাধক। রসকে কি চিবান যায়? "চৈতন্য চরিতামৃত" রস আস্বাদন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"অশেষ বিশেষে কৈল রসের চর্ব্বন।"

খেজুরের রস চর্ব্বন করা যায় না। তাহা দ্বারা গুড়, চিনি, মিশ্রী, সিভামিশ্রী তৈয়ারী হইলে চর্ব্বণ প্রয়োজন হয়।

শ্রীভগবানের নাম রসপূর্ণ। তিনি নিজে রস স্বরূপ। তাই তাঁহার নামও ঐরূপ। অভিন্নত্বাৎ—নাম নামিনঃ। ভক্ত যখন একাসনে তন্ময় হইয়া রসাল নাম জপ করে তখন সে নামের মধ্যে নিহিত রসকে চর্ব্বণ করে। জপ পরায়ণ ভক্ত মাংস সাধক।

মৎস্য ভক্ষণ। মৎস্য সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে একটি অপূর্ব্ব উক্তি আছে—

গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎসৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥

গঙ্গা যমুনা দুই নদীতে দুই মৎস্য সতত সঞ্চরণ করে। সেই মৎস্য যে আহার করে সে মৎস্য সাধক।

দুটি নাসারন্ধ্রে গঙ্গা যমুনায় সতত দুই মৎস্য—শ্বাস প্রশ্বাস রূপে নিয়ত চলিতেছে। সেই মৎস্য আহার করিতে হইবে। বশীভূত করিতে হইবে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে—তাহাকে শৃঙ্খলায় আনিয়া পূরক—রেচকে পরিণত করিতে হইবে। তারপর কুম্ভকে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। গভীরভাবে ধ্যান জপ করিতে করিতে কুম্ভক আপনা-আপনিই হইয়া যায়। তখন শ্বাস চলে সুষুম্নায়। গঙ্গা যমুনা স্তব্ধ, সরস্বতী বহমানা হয়। ইহা যাহার নিত্যই ঘটে, সে নিত্যই মৎস্য আহার করে। মৎস্য সাধনে আরাধ্যের সঙ্গে একাত্মতা আনে।

মৈথুন সাধন—মিথুন অর্থ দুইজন। মিথুনের ভাব—মৈথুন যুগবদ্ধ হইয়া যে আনন্দ আস্বাদন। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রগাঢ় মিলনে যে সুখ, তাহা মৈথুন সুখ। পাশবদ্ধ পশু জীবের ঐ সুখ কামজ। উহার স্থিতি কয়েকক্ষণ। দিব্য ভাবের সাধকের আরাধ্য বস্তুর সঙ্গে যে অপার্থিব মিলন সেখানে কামের স্থান নাই। ঊর্ধ্বরেতা সাধকের আরাধ্য সঙ্গে যে মিলন, তাহা গভীর প্রীতি হইতে জাত।

দিব্য ভাবের সাধক জানেন, বিশ্বের সকল বস্তুতেই এক মহাশক্তি বিদ্যমান আছেন। তাঁহার সঙ্গে মৈথুন সর্ব্বদাই চলিতেছে। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্যের আলো, জল, মাটির মধ্য দিয়া মিলন খেলা সদাই চলিতেছে। সেই মিলন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে কখন?

সাধক জানে মহাশক্তি তাহার নিজ দেহে কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিতা। তিনি আছেন নিদ্রিতা। তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগ্রত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে শিব সন্নিধানে। শিব আছেন সহস্রারে। তাঁহার সঙ্গে মহাশক্তির মিলন ঘটাইয়া দেওয়াতেই মৈথুন সাধকের পরিতৃপ্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধুর ভাবের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়। নিত্য মিথুন শ্রীরাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত আস্বাদনের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গুরু মঞ্জরীর আনুগত্যে আস্বাদন। ইহাই মধুর রসের সাধকের সেবা।

তন্ত্রের সাধক ইহাই কামনা করেন। প্রকাশের পরিভাষার পার্থক্যে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে আগ্রহী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত আনন্দ পাবেন, উপকৃত হইবেন। গ্রন্থে পাবেন তান্ত্রিক বিরাট সংস্কৃতির অনেক গভীর সংবাদ—শক্তিতত্ত্ব, দশ মহাবিদ্যার তত্ত্ব, শাক্ত দর্শন তত্ত্ব, কুণ্ডলিনী তত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, গুরুতত্ত্ব, শিবলিঙ্গ রহস্য, ধ্যান, সাধন ইত্যাদি অনেক কিছু। এইসবের বিশ্লেষণ, তাৎপর্য্যালোচনা—গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় সুষ্ঠু ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে তন্ত্রসিদ্ধ মহাসাধকের কারুণ্যপূর্ণ করে ইহা সমর্পিত হবে, তিনি নিত্যধাম হইতে শ্রীহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যে শিষ্যার আনন্দবিধান করিবেন—এটি আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। আশুবাবুর সাধনা সার্থক। আশ্রম-জননীর আনন্দ বিধানে তিনি কৃতকার্য্য। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

বিনীত—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

আশীর্ব্বচন

শ্রী শ্যামা শরণং

শিলং যোগমায়া আশ্রমের তন্ত্রসাধক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় 'তন্ত্ররশ্মি' নামক একখানি উত্তম গ্রন্থ লিখিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছেন।

ভারতে অধিকারিভেদে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্যমান থাকিলেও কলিযুগের বিশেষতঃ ঘোর কলির বহু মানব একেবারে অবিশ্বাসের পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন, ফলে সেইসব মানব সম্প্রদায় ভগবদ্ বিশ্বাস বঞ্চিত হইয়া অভারতীয় ভাবে নিমগ্ন হইতেছেন। এই সন্ধিক্ষণে তন্ত্ররশ্মির অভ্যুদয়—ভারতের কল্যাণপ্রদ শুভদিনের আগমন বলিয়া আমি মনে করি।



শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

তন্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হইলে মানুষ এক মহান্ ভাবের মধ্যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করিবে।

তন্ত্ররশ্মির সাধনা পথ এক অপূর্ব যুগধর্মের সমাধান। যাহা প্রাচীন বৈষ্ণবাদি সাধনায় হেয়, পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত তাহার সমাধান এই যে—স্থূলভাবে ও সূক্ষ্মভাবে, অর্থাৎ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করিলে সর্ববিধ অধিকারী

সাধনা পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। ইহাই কলিতে তন্ত্রমার্গের বৈশিষ্ট্য।

আমি অন্তঃকরণের শুভেচ্ছা প্রদান করিতেছি যেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় যে কল্যাণপথে অগ্রসর হইয়াছেন সেই পথে তিনি যেন সিদ্ধিলাভ করেন।

তন্ত্ররশ্মি সম্প্রদায় জয়যুক্ত হউন। ইহাই শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে প্রার্থনা জানাই।

আমাদের গৃহে ১২৩৩ সাল হইতে শ্রীশ্রী রটন্তী কালিকার পূজা এবং একশত বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্রীকালীপূজা হইয়া আসিতেছে। পূজ্যপাদ পিতৃদেব এই শাক্তভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া শাক্তবেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাবকে সংবর্দ্ধিত করিবার জন্যই তন্ত্ররশ্মির আলোক দর্শন করিলাম।

বিনীত—

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সূচীপত্র

"ন চ তন্ত্রাৎ পরং শাস্ত্রং
ন চ তন্ত্রাৎ পরো গুরোঃ।
ন চ তন্ত্রাৎ পরা পন্থা
ন চ তন্ত্রাৎ পরা গতিঃ॥"

"কলৌ কালী সুসিদ্ধাচ কলৌ কালী বরপ্রদা
কলৌ কালী সাধকস্য দর্শনার্থ সমুদ্যতা॥"

অবতারণা

বর্ত্তমান যুগের ঋষি, মহাযোগী মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ ডি, লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে একদিকে যেমন বৈদিক সাধন-রহস্য ভেদ করা আবশ্যক ; অপরদিকে তেমনি নিগূঢ় তান্ত্রিক-রহস্যের দ্বারও উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। আলোচনার বিভিন্ন দিক্ আছে ; রুচি, প্রয়োজন ও অধিকার ভেদে সকল দিক্ হইতেই আলোচনার সার্থকতা আছে।"

Sir John Woodroffe, former Judge of Calcutta High Court, writes :—

"The Tantras say—'Begin practising under the guidance of a good GURU ; if you do not obtain favourable results immediately, you can freely give it up'. No other religion dares to give so bold a challenge. We believe that the Sādhanā of the Moslems and the 'esoteric religion' or secret Sādhanā (and rituals) of the Christians of the Roman Catholic and Greek Churches is based on the ground work of the Tantras."

বাংলায় সারমর্ম্ম ঃ সুবিখ্যাত তন্ত্রবিদ্, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় স্যার জন উড্রফ্ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তব্য এই যে 'সুদক্ষ গুরুর তত্ত্বাবধানে ক্রিয়া অভ্যাস করিতে আরম্ভ করুন ; আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে সুফল লাভ না করেন, অবাধে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন।' মনে হয় অন্য কোন ধর্ম্ম এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাইবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে মুসলমানদের সাধনা এবং রোমান ক্যাথলিকদিগের গুপ্ত সাধনা এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মূল ভিত্তি হইল তন্ত্রের তত্ত্বসমূহ।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের গুরুত্ব যে অপরিসীম তাহা সহজেই অনুমেয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনতা

তন্ত্রশাস্ত্র অতি প্রাচীন। বেদের সায়ণ ভাষ্যে তন্ত্রের শ্লোকের ব্যবহার আছে। বেদান্তের শারীরক ভাষ্যে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া বিখ্যাত 'প্রপঞ্চসার তন্ত্র' আদি শঙ্করাচার্য্য রচনা করিয়াছেন এবং তৎকৃত 'আনন্দ লহরী' স্তবে তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতার টীকাকার মহামতি কুল্লুকভট্ট বঙ্গদেশের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মহর্ষি হারীতের একটি বাক্য তৎকৃত টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"বৈদিকী তান্ত্রিকীচৈব দ্বিবিধা কীর্ত্তিতা শ্রুতিঃ।"

শ্রুতি দুই প্রকার—**বৈদিকী** ও **তান্ত্রিকী**।

হরিবংশে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ চৌষট্টিখানি অদ্বৈত তন্ত্র ঋষি দুর্ব্বাসার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে দুর্ব্বাসাই কলিযুগে অদ্বৈত তন্ত্রের প্রকাশক।

বিখ্যাত ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক মার্গের উপাসক, আবার কেহ কেহ তান্ত্রিক উপাসনার প্রবর্ত্তক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্ম যামলে এবং জয়দ্রথ যামলে দধীচি, সনৎকুমার, দুর্ব্বাসা, সনক, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু প্রভৃতি ঋষি মহর্ষিদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে ঋষি অগস্ত্য এবং তদীয় ধর্ম্মপত্নী লোপামুদ্রা উচ্চকোটির বৈদিক ঋষি ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অগস্ত্য মেরুস্থিত শ্রীমাতার দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। কারণ ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার তান্ত্রিকী দীক্ষা হয় নাই। পরে দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক শাক্ত দীক্ষা গ্রহণের পর উভয়ে অতি উচ্চ পর্য্যায়ের সিদ্ধিলাভ করেন।

এক সময়ে তন্ত্রের 'কাদি' এবং 'হাদি' মত বহুদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রবিস্তারের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে তান্ত্রিক সংস্কৃতির বিস্তার লাভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে যেমন তান্ত্রিক সংস্কৃতি বাহিরে গিয়াছে, তেমনি বাহির হইতেও কোন কোন

কারণ হিসাবে বলা হয় যে সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিযুগে মাত্র একপাদ অবশিষ্ট আছে।

অন্যদিকে বহু প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে কলি প্রবল হইলে পর বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি মতে কোন ক্রিয়াই ফলপ্রসূ হইবে না। কলি প্রবৃত্ত হওয়ার পাঁচ হাজার বৎসর গতে (কলি) প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই হিসাবে উক্ত পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়া আরও প্রায় একশত বৎসর চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে বর্ত্তমানে দশকর্ম্ম যেমন উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা একমাত্র তান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। তদন্যথায় ক্রিয়া ফলপ্রসূ হইবে না; অধিকন্তু ক্রিয়াকর্ত্তা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ কৌলসাধক পণ্ডিতপ্রবর ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় (যাঁহাকে লোকে শিবতুল্য পুরুষ মনে করিত) দশকর্ম্ম এবং পূজাসংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করার নিমিত্ত তান্ত্রিক পদ্ধতি রচনা করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ এই বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তৎকালীন সাময়িক পত্রিকায় স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা চলিতে থাকে। পরে কলিকাতার 'বসুমতী' পত্রিকার চেষ্টায় প্রতিবাদ লিপি আবাহন করা হয়। অবশেষে বিচার বসে—সেখানে বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া সংগৃহীত প্রতিবাদ লিপির বিষয়বস্তু শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন।

কলি প্রবল হইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে এবং দুঃসময়ে কি কি আচরণ করিলে কলির উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে তাহার সবিস্তার বর্ণনা বহু তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে বহুল প্রচারিত 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের' চতুর্থোল্লাসের প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলি প্রবল হওয়ার পর বর্ত্তমানকালে আমাদের পূজাদি যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্ম

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা উচিত; তদন্যথায় অর্থ নষ্ট, বৃথা পরিশ্রম এবং সবচেয়ে বড় কথা মহাপাতকী হওয়ার কঠোর নির্দ্দেশ তন্ত্রে আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"দ্বাপর যুগে বেদোক্ত এবং তন্ত্রোক্ত প্রকরণে এবং কলিযুগে জীব বিবিধ তন্ত্রোক্ত প্রকারে ভগবানকে আরাধনা করিবে।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।২৮ এবং ১১।৫।৩১)।

পাঠকবৃন্দের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন উপরোক্ত আলোচনার মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া কলি প্রবল হওয়ার পর তন্ত্রোক্ত আচরণবিধি অবহেলা না করেন।

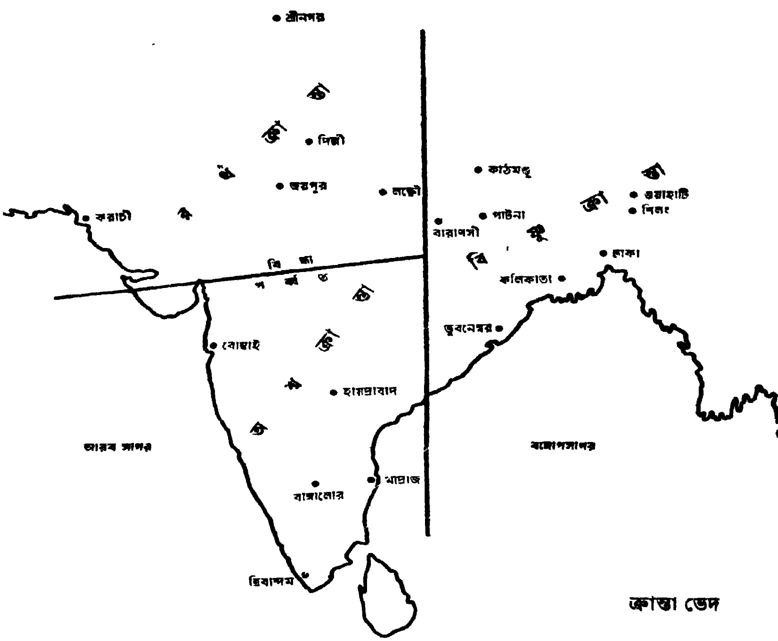
স্থানভেদে সাধনার পার্থক্য

তন্ত্রাচার্য্যগণ আশুফলপ্রদ সাধনার প্রবর্ত্তন করার উদ্দেশ্য নিয়া সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে ভারতবর্ষ তথা ভূমণ্ডলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগকে ক্রান্তা নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা প্রতি ক্রান্তার জন্য চৌষট্টি (৬৪) খানা, একুনে ৩ × ৬৪ = ১৯২ খানা তন্ত্র প্রণয়ন করেন। ক্রান্তায় ক্রান্তায় সাধন ক্রিয়ার পার্থক্য প্রচুর। পাঠকবৃন্দ একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন তন্ত্রাচার্য্যগণ কি পরিমাণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়া বিচার বিশ্লেষণপূর্ব্বক তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যাহার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

কথামৃত গ্রন্থে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ৬৪ তন্ত্রের সাধনার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে—যাহা বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ খানা তন্ত্র।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি বিন্দু বসাইয়া উত্তর-দক্ষিণে একটি রেখা টানিলে ঐ রেখা উত্তরদিকে বারাণসীর পশ্চিম দিয়া হিমালয়ের দিকে সম্প্রসারিত হইয়া চীনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ঐ রেখার অন্য দিক দক্ষিণমুখী হইয়া সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে। এই উত্তর-দক্ষিণ রেখার পূর্ব্বাঞ্চল (বারাণসী সহ) 'বিষ্ণুক্রান্তা' নামে অভিহিত।

আবার উপরোক্ত বিন্দু হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর দিয়া পশ্চিম-দিকে একটি রেখা টানিলে সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। ঐ রেখাদ্বয়ের পশ্চিমোত্তর খণ্ড 'রথক্রান্তা' এবং দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ড 'অশ্বক্রান্তা' নামে পরিচিত।



ক্রান্তা ভেদ

ক্রান্তাভেদে প্রচলিত ৬৪ তন্ত্রের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে সামান্য মতান্তর আছে। যেমন, বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত 'তন্ত্রান্তর'-এর স্থলে কাহারো কাহারো মতে 'যোগার্ণব' হওয়া উচিত। আবার কোন কোন তন্ত্র একাধিক ক্রান্তায় প্রচলিত।

(ক) বিষ্ণুক্রান্তার তালিকা

১। সিদ্ধীশ্বর
২। কালীতন্ত্র
৩। কুলার্ণব
৪। জ্ঞানার্ণব
৫। নীলতন্ত্র
৬। ফেৎকারী
৭। দেব্যাগম
৮। উত্তর
৯। শ্রীক্রম
১০। সিদ্ধিযামল
১১। মৎস্য সূক্ত
১২। সিদ্ধসার
১৩। সিদ্ধিসারস্বত
১৪। বারাহী
১৫। যোগিনী
১৬। গণেশবিমর্ষিনী
১৭। নিত্য-তন্ত্র
১৮। শিবাগম
১৯। চামুণ্ডা
২০। মুণ্ডমালা
২১। নিরুত্তর
২২। হংস-মহেশ্বর
২৩। কুল প্রকাশক
২৪। দেবী কল্প
২৫। গন্ধর্ব্ব
২৬। ক্রিয়াসার
২৭। নিবন্ধ
২৮। স্বতন্ত্র
২৯। সম্মোহন
৩০। তন্ত্র-রাজ
৩১। ললিতা
৩২। রাধা
৩৩। মালিনী
৩৪। রুদ্রযামল
৩৫। বৃহৎ শ্রীক্রম
৩৬। গবাক্ষ
৩৭। সুকুমুদিনী
৩৮। বিশুদ্ধেশ্বর
৩৯। মালিনী-বিজয়
৪০। সময়াচার
৪১। ভৈরবী
৪২। যোগিনী-হৃদয়
৪৩। ভৈরব
৪৪। সনৎকুমার
৪৫। যোনি
৪৬। তন্ত্রান্তর
৪৭। নবরত্নেশ্বর
৪৮। কুলচূড়ামণি
৪৯। ভাবচূড়ামণি
৫০। দেবপ্রকাশ
৫১। কামাখ্যা
৫২। কামধেনু
৫৩। কুমারী
৫৪। ভূতডামর
৫৫। যামল
৫৬। ব্রহ্মযামল
৫৭। বিশ্বসার
৫৮। মহাকাল

৫৯। কুলদ্দীশ
৬০। কুলামৃত
৬১। কুব্জিকা
৬২। তন্ত্রচিন্তামণি
৬৩। কালীবিলাস
৬৪। মায়াতন্ত্র

(খ) রথক্রান্তার তালিকা

১। চিন্ময়
২। মৎস্যসূক্ত
৩। মহিষমর্দ্দিনী
৪। মাতৃকোদয়
৫। হংস-মহেশ্বর
৬। মেরু তন্ত্র
৭। মহানীল
৮। মহা-নির্ব্বাণ
৯। ভূত-ডামর
১০। দেব-ডামর
১১। বীজচিন্তামণি
১২। একজটা
১৩। বাসুদেব-রহস্য
১৪। বৃহদ্‌গৌতমীয়
১৫। বর্ণ-ধৃতি
১৬। ছায়ানীল
১৭। বৃহদ্‌যোনি
১৮। ব্রহ্মজ্ঞান
১৯। গারুড়
২০। বর্ণ-বিলাস
২১। বালা-বিলাস
২২। পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা
২৩। পুরশ্চরণ-রসোল্লাস
২৪। পঞ্চদশী
২৫। পিচ্ছিলা
২৬। প্রপঞ্চসার
২৭। পরমেশ্বর
২৮। নবরত্নেশ্বর
২৯। নারদীয়
৩০। নাগার্জুন
৩১। যোগসার
৩২। দক্ষিণা-মূর্ত্তি
৩৩। যোগ-স্বরোদয়
৩৪। যক্ষিণী তন্ত্র
৩৫। স্বরোদয়
৩৬। জ্ঞান-ভৈরব
৩৭। আকাশ-ভৈরব
৩৮। রাজরাজেশ্বরী
৩৯। রেবতী
৪০। সারস
৪১। ইন্দ্রজাল
৪২। কৃকলাস-দীপিক
৪৩। কঙ্কাল মালিনী
৪৪। কালোত্তম
৪৫। যক্ষডামর
৪৬। সরস্বতী
৪৭। শারদা
৪৮। শক্তিসঙ্গম
৪৯। শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব
৫০। সম্মোহিনী

৫১। আচারসার
৫২। চীনাচার
৫৩। ষড়াম্নায়
৫৪। করালভৈরব
৫৫। সোঢ়া
৫৬। মহালক্ষ্মী
৫৭। কৈবল্য
৫৮। কুলসদ্ভাব
৫৯। সিদ্ধি-তদ্ধরী
৬০। কৃতিসার
৬১। কালভৈরব
৬২। উদ্দামরেশ্বর
৬৩। মহাকাল
৬৪। ভূতভৈরব

(গ) অশ্বক্রান্তার তালিকা

১। ভূত-শুদ্ধি
২। গুপ্ত-দীক্ষা
৩। বৃহৎসার
৪। তত্ত্বসার
৫। বর্ণসার
৬। ক্রিয়াসার
৭। গুপ্ত-তন্ত্র
৮। গুপ্ত-সার
৯। বৃহৎ-তোড়ল
১০। বৃহন্নির্ব্বাণ
১১। বৃহৎ কঙ্কালিনী
১২। সিদ্ধ-তন্ত্র
১৩। কাল-তন্ত্র
১৪। শিব-তন্ত্র
১৫। সারাৎসার
১৬। গৌরী-তন্ত্র
১৭। যোগ-তন্ত্র
১৮। ধর্ম্মক-তন্ত্র
১৯। তত্ত্বচিন্তামণি
২০। বিন্দু-তন্ত্র
২১। মহা-যোগিনী
২২। বৃহদ্-যোগিনী
২৩। শিবাঞ্জন
২৪। সম্বর
২৫। শূলিনী
২৬। মহামালিনী
২৭। মোক্ষ
২৮। মহা-মোক্ষ
২৯। বৃহন্মালিনী
৩০। বৃহন্মোক্ষ
৩১। গোপী-তন্ত্র
৩২। ভূতলিপি
৩৩। কামিনী
৩৪। মোহিনী
৩৫। মোহন
৩৬। সমীরণ
৩৭। কামকেশর
৩৮। মহাবীর
৩৯। চূড়ামণি
৪০। গুর্ব্বচ্ছর্ন

৪১। গোপ্যা
৪২। তীক্ষ্ণ
৪৩। মঙ্গলা
৪৪। কামরত্ন
৪৫। গোপলীলামৃত
৪৬। ব্রহ্মাণ্ড
৪৭। চীন
৪৮। মহানিরুত্তর
৪৯। ভূতেশ্বর
৫০। গায়ত্রী
৫১। বিশুদ্ধেশ্বর
৫২। যোগার্ণব
৫৩। ভেরুণ্ডা
৫৪। মন্ত্রচিন্তামণি
৫৫। যন্ত্রচূড়ামণি
৫৬। বিদ্যুল্লতা
৫৭। ভুবনেশ্বরী
৫৮। লীলাবতী
৫৯। বৃহচ্ছীন
৬০। কুরঞ্জ
৬১। জয় রাধামাধব
৬২। উজ্জাসক
৬৩। ধূমাবতী
৬৪। শিব

মোক্ষ বা মুক্তি

জীবের চরম লক্ষ্য—মোক্ষ বা মুক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আছে—**"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"**—বহুজন্মের পর জ্ঞানবান হইয়া জীব আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই মোক্ষ বা মুক্তি কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়।

সব ধর্ম্মশাস্ত্রে জীব কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। কিন্তু তন্ত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তন্ত্রের লক্ষ্য জীবদ্দশায় প্রকৃত সুখ ভোগ এবং অন্তে মোক্ষ লাভ। ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাজর্ষি জনক।

"জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি,
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেত পেত দুধের বাটি।"

নিরাসক্তিতে মোক্ষ লাভ হয় বলিয়া তন্ত্র সকলকে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তত্ত্বনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই তত্ত্বজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈত না অদ্বৈত? তাহার স্বরূপ কি? তন্ত্রের উত্তর—

ইহা দ্বৈতাদ্বৈত বর্জ্জিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে তন্ত্র সাধকের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি, যাহা বিচারের দ্বারা লভ্য নহে। একমাত্র বিচারের সময় প্রশ্ন জাগে—ইহা দ্বৈত না অদ্বৈত। আবার বিচারের কর্ত্তা মন। যে অবস্থায় ব্রহ্মোপলব্ধি হয়, মন তখন ভাবে তন্ময় হইয়া পরমতত্ত্বে লীন। সেই অবস্থায় দ্বৈত বা অদ্বৈতের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধনা মুখ্যতঃ গৃহীর সাধনা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সংসার ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াই নিরাসক্তভাবে দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া চলা। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া,
পরিমিত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।"

এতদ্ব্যতীত তন্ত্রে ভোগের মাধ্যমে, বিশেষ ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারাও ভোগবাসনার নিবৃত্তির ব্যবস্থা আছে, যার ফলে দিব্যভাবের উদয় এবং পরিণামে মোক্ষ লাভ হয়।

"যত্রাস্তি ভোগ ন চ তত্র মোক্ষঃ
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।"
দেবিপদাম্ভোজ—সমাশ্রিতানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥"

যিনি বিষয়ের মধ্যে প্রবৃত্ত অর্থাৎ ডুবিয়া রহিয়াছেন, তিনি মোক্ষ লাভে বঞ্চিত ; আবার যিনি মোক্ষ লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে বিষয়ের বিষ হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে। কিন্তু তন্ত্রের বিধান মানিয়া যিনি দেবতার আরাধনায় মগ্ন, তিনি ইহজীবনে সুখভোগ এবং জীবনান্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

এইসব ব্যাপারে ভবরোগের বৈদ্য সদ্‌গুরুই পথ নির্দ্দেশক।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

প্রবৃত্তি বিষয়মুখী বা ভোগমুখী আর নিবৃত্তি আত্মাভিমুখী। মোক্ষ লাভের জন্য নিবৃত্তি অত্যাবশ্যক। তন্ত্রশাস্ত্র বাস্তবতা, প্রকৃতি এবং মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া রচিত। মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ রুচি ও স্বভাবের অনুকূল সাধন-পদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। মানুষের সংস্কার, প্রকৃতি, রুচি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তন্ত্রাচার্য্যগণ স্বল্পায়ু কলির জীবের' জন্য যে সব সহজ সরল সাধন-পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অল্প আয়াসে এবং কম সময়ের মধ্যে তন্ত্র-সাধক অভীষ্ট সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ইহা তন্ত্র-সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নিবৃত্তি লাভ দুই প্রকারে সম্ভব। প্রথম পন্থা—প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া দমন করা এবং দ্বিতীয় উপায়—প্রবৃত্তিকেই ভিতরে ভিতরে নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করা। প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া দমন করা অতীব কঠিন ব্যাপার। প্রবৃত্তিকে ভোগবাসনা বলা হয়। ভোগায়তন দেহ যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন দেহধর্ম্মের নিয়মে ভোগবাসনাও থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মানুষের শরীরে বুভুক্ষা, পিপাসা, নিদ্রার ইচ্ছা এবং রতিস্পৃহা—এই চারি-প্রকার বাঞ্ছা জাত হয়। তন্ত্রের পঞ্চ 'ম' কার সাধনা উক্ত চতুর্বিধ বাঞ্ছা পূরণের অনুকূল। দেহ-ধর্ম্মের প্রবৃত্তির অনুকূল বলিয়া মাংস ভক্ষণে, মদ্যপানে এবং মৈথুনে কোন দোষ হয় না স্বীকার করিয়া মনুসংহিতা নিবৃত্তিকে মহাফলদায়ক বলিয়াছেন।

মহারাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে চমস্ মুনি অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে (১১।৫।১১) বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে যজ্ঞে আমিষ ভোজন ও মদ্যের ব্যবস্থায় নিতান্ত আসক্তিশীল পুরুষের পক্ষে নিবৃত্তিরই বিধান করা

হইয়াছে। এইগুলি শাস্ত্রবিধির অন্তর্গত থাকিলে সর্ব্বাবস্থায় কল্যাণপ্রদ হয়।

প্রকৃতির বিধানে যে সব বস্তুতে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল, সেইসব বস্তু সে ভোগ করিবেই করিবে। এইরূপ কাজ হইতে তাহাকে বিরত করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাই তন্ত্রশাস্ত্র ইহার নিন্দা না করিয়া কৌশলে বিধিনিষেধ আরোপ করতঃ ঐ সব প্রবৃত্তিতে ধর্ম্মবোধ এবং শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন।

তন্ত্রের বাস্তবতাবোধ কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে পাঠকবৃন্দ একবার ভাবিয়া দেখুন।

সংখ্যাবৃদ্ধিতে গুণবৃদ্ধি

রুদ্র যামলে আছে—

"যুক্তিমূলং মহাভাবং যুক্তিমুখং হি সাধনং।
যুক্তি ক্রমেণ কালেন সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ॥"

মহাভাব তথা ব্রহ্মভাবের মূল যুক্তি। সাধনার মূলও যুক্তি। এই যুক্তির ক্রম ধরিয়া সাধক যথাকালে সিদ্ধি লাভ করেন।

যুক্তির আর এক অর্থ যোগ। সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে পারিলেই বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়া উঠে। এক ব্যক্তি প্রথমে নিজের পরিবার পরিজন, ক্রমে প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী, এমন কি পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি এবং সর্বশেষে গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলে পর তাহার মহাভাবের উদয় হইতে পারে।

ইদানীং কালে বিশ্বমৈত্রীর কথা মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত হইয়া থাকে এবং ইহার আদর্শের মহনীয়তার কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এখন একবার ভাবিয়া দেখুন— তন্ত্রের ভাবধারা কত উচ্চ এবং কত মহান্।

রসায়নবিদেরা বলেন—মৌলিক পরমাণুর সংখ্যা যত বাড়ে, রাসায়নিক পদার্থের গুণও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা পরিবর্ত্তন লাভ করে। মোট কথা সংখ্যাই গুণের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—দুধ হইতে দৈ। দৈ প্রস্তুত করার সময় দুধের সঙ্গে অল্প সাঁজা মিশাইতে হয়। ঐ সাঁজাতে থাকে একপ্রকার জীবাণু (Bacteria) যাহার ধর্ম্ম হইল নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় কয়েক মিনিটে সহস্রাধিক হইয়া দুধের রূপান্তর ঘটান এবং যাহার ফলে দৈ প্রস্তুত হয়।

ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবেত প্রার্থনাদির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহার ভিত্তি উপরোক্ত নিয়মপ্রণালী। আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনাদির বেলা একই নিয়ম কাজ করে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এখানে স্বয়ং নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন "আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিগণের অন্তরে বাস করি না—আমি অবস্থান করি সেই স্থানে যেখানে ভক্তবৃন্দ (সমবেতভাবে) আমার গুণগান করিতেছে।"

উপরোক্ত শ্লোকে 'মদ্ভক্তাঃ' বহুবচন প্রয়োগ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কিরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক—পাঠকবৃন্দ একবার ভাবিয়া দেখুন।

ন্যাস

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধনায় দেবতা-সান্নিধ্য এবং সিদ্ধিলাভের জন্য 'ন্যাস' একটি উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

দেহের যে যে স্থানে যে যে দেবতার বীজ ও দেবতা আরোপিত হইয়া থাকেন, সেই সেই স্থানের জ্ঞানমাত্র তৎ তৎ স্থানে আরোপিত বীজ-দেবতাদিরও স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপ ন্যাস দ্বারা সাধক

বীজমন্ত্রময় শরীর এবং দেবতার ন্যাস দ্বারা দেবময় শরীর লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দেবতার স্বরূপ জানিয়া বিশেষ বিশেষ ন্যাস করিতে হয়। এর ফলে সাধক মন্ত্রময় এবং দেবময় বিগ্রহত্ব লাভ করেন। মহর্ষি বাৎসায়ন তৎকৃত ভাষ্যে (প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে) ন্যাস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ন্যাসসিদ্ধ সাধক কোন মনুষ্যকে প্রণাম করিলে সেই লোকটির মৃত্যু ঘটিতে পারে। সিদ্ধপুরুষ ভাস্কর রায়ের জীবনীতে এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

আসন

তন্ত্রে চুরাশি প্রকার আসনের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে বত্রিশটি প্রধান। আবার ৩২টির মধ্যে চারিটি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই চারিপ্রকার আসন—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন এবং স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত।

আসন দেহের স্নায়ুতন্তু ও পেশীগুলিকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখে, যার ফলে শারীরিক ও মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি হয়। সাধনার সময় ইহার মূল্য অপরিসীম। আসনের সাহায্যে অনেক সময় দুরারোগ্য ব্যাধি সারানো যায়।

মুদ্রা

মুদ্রা বহুপ্রকার। ইহা দেহস্থ বহিঃ-স্রাবী এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় করিয়া সবল রাখে। যাহা দর্শন করিলে সমুদয় দেবগণের মুৎ অর্থাৎ প্রীতি জন্মায় এবং যাহা হইতে পাপরাশি দূরীভূত হয়, তাহাকে মুদ্রা বলে। পূজাকালে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য বলা চলে।

পূজায়, জপে, ধ্যানে, কাম্যকর্ম্মে, স্নানে, আবাহনে. শঙ্খস্থাপনে, প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, রক্ষণে, নৈবেদ্য দানে এবং অন্যান্য কল্পোক্ত কার্য্যে স্ব স্ব লক্ষণে লক্ষিত মুদ্রা প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। নৃত্যেও মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

সৃষ্টি রহস্য

সূর্য্য-বিজ্ঞান তন্ত্রের অন্যতম অবদান। ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান একমত যে সূর্য্যকিরণ হইতে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে। একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক (Heackel) বলিয়াছেন "There is much more sense in worshipping the sun than in worshipping Christ."

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজ (যিনি গন্ধবাবা নামে প্রসিদ্ধ) সূর্য্যকিরণের সাহায্যে বহুপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতেন। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে লোককল্যাণের নিমিত্ত বর্তমান যুগোপযোগী নূতন নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা প্রচুর।

বৈদিক সাহিত্যে **'কুত আজাতা ? কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ?'** ইত্যাদি বাক্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক ঋষি সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা আধুনিককালে এই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

› তান্ত্রিক আচার্য্যগণ এই গভীর রহস্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কামকলা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কামই হইলেন জগৎ প্রসবিতা রবি। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ক্রিয়া চলিতেছে সূর্য্য হইতে। তান্ত্রিক পরিভাষায় সোমতত্ত্ব (সৃষ্টি), অগ্নিতত্ত্ব (সংহার) উভয়েই সূর্য্যের মধ্যে নিহিত, যদিও উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ তত্ত্ব। সহজ কথায় সূর্য্যের সোমশক্তি এবং অগ্নিশক্তির ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে।

অভিচার ক্রিয়া

তন্ত্রে পাঁচটি অভিচার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এইগুলি মারণ, উচ্চাটন, মোহন, স্তম্ভন ও বশীকরণ নামে অভিহিত। এইসব ক্রিয়ার জন্য তন্ত্রবিদ্‌কে সকলে ভয়ের চক্ষে দেখেন; আবার নিজেদের মতলব আদায়ের জন্য সেইসব ব্যক্তিরাই তন্ত্রবিদের দ্বারস্থ হন। সত্য কথা এই যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ কখনও নিকৃষ্ট পন্থার প্রশ্রয় দিবেন না। তন্ত্রের দিব্যভাবের সাধকের পক্ষে কোন প্রকার ঘৃণ্য কাজ সম্পাদন কল্পনার বহির্ভূত। সমাজে কিছুসংখ্যক লোক অর্থ উপার্জনের জন্য নিকৃষ্ট বা নিম্নস্তরের কাজে ব্যাপৃত হন বলিয়া মহান্‌ অভিচার ক্রিয়াকে কোন অবস্থায় দোষ দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

আমরা এখানে তন্ত্রের অভিচার ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। ইহা হইতে পাঠকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে অভিচার ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি এবং প্রয়োজনবোধে সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের উপকার সাধন করা।

অভিচার শব্দের অর্থ :—অভি শব্দে সম্মুখ এবং 'চার' শব্দে চলা বুঝায়। সুতরাং 'অভিচার' শব্দে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বুঝিতে হইবে। যে দিকে তাকাই না কেন—ঈশ্বর বিশ্বরূপে মূর্তিমন্ত—তাঁহাকে পাওয়া বা লাভ করা বুঝায়।

অন্যমতে—মন্ত্রবলে দুষ্টব্যক্তিদের দমন অথবা নিঃশব্দ শাসন। ইহার ফলে আইনের সাহায্যে যেসব দুষ্টব্যক্তিদের শাসন সম্ভব নয়, তাহাদিগকে অভিচার ক্রিয়ার অন্তর্গত মন্ত্র বলে নিঃশব্দে শাসন সম্ভব। পাঁচ প্রকার অভিচার ক্রিয়ার উদ্দেশ্য যে কত মহান্‌, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

১। **মারণ**—এই ক্রিয়ায় নিজের 'অহং' বোধকে বিনাশ করা বুঝায়। একটি কথা আছে **'আমি মার, মা আমার'**। সাধক নিজের 'অহং' বোধকে মায়ের চরণে সমর্পণ করিলেই

অহংভাব চিরতরে নির্ম্মূল হইবে। ইহাকে মারণ অভিচার কহে। ইহা অন্নময় কোষের ক্রিয়া।

২। **উচ্চাটন**—উচ্চ অটন বা বিচরণ করার শক্তি। যাহার মোহের অন্ত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নিজেকে ভুলিতে পারিয়াছেন, তিনিই ইচ্ছামাত্র যেখানে সেখানে গমনে সমর্থ। ইহা প্রাণময় কোষের ক্রিয়া।

৩। **মোহন**—এই ক্রিয়ার ফলে সাধক ভুবনেশ্বরীর রূপ দেখিয়া মোহিত বা রূপের মধ্যে ডুবিয়া যান। ইহা মনোময় কোষের ক্রিয়া।

৪। **স্তম্ভন**—এই ক্রিয়ার সাহায্যে সাধক স্তম্ভের মত বসিয়া থাকেন। এই ভাবটি সন্ত তুলসীদাসের একটি দোঁহায় খুবই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দোঁহাটি এইরূপ—

"সব্‌সে হিলিয়ে, সব্‌সে মিলিয়ে, লিজিয়ে সব্‌কা নাম,
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিয়ে বসে আপনা ঠাম।"

ইহা বিজ্ঞানময় কোষের ক্রিয়া।

৫। **বশীকরণ**—নিজেকে বিশ্বের বশে এবং বিশ্বকে নিজের বশে আনিয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকা। মনে আসে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহজ সরল উক্তি—"রসে বশে থাক।" এই অবস্থাকে পরামুক্তি, পরাগতি, পরাশান্তি প্রভৃতি বাক্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহা আনন্দময় কোষের ক্রিয়া।

পাঠকবৃন্দ একবার ভাবিয়া দেখুন এই পঞ্চ অভিচার ক্রিয়ার সাহায্যে সাধক কত উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হন।

তন্ত্রাচার

তন্ত্রের সাতটি আচারের মধ্যে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার এবং শৈবাচার পশুভাবের অন্তর্গত। দক্ষিণাচার পশু ও বীরভাবের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের সহায়ক। কৌলাচার বীরভাবের অন্তর্গত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত দিব্যভাবে পৌঁছাইয়া দেয়।

কলিকালে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার এবং শৈবাচার সম্ভব নয় বলিয়া বৈদিক, পৌরাণিক অথবা স্মৃতিসম্মত মন্ত্র এবং ক্রিয়াদি ফলপ্রসূ হইতে পারে না। কেহই বেদাচার-সম্মত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুকুলে বাস, তৎপর দারপরিগ্রহ, সর্ব্বশেষে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন না। বর্ত্তমান কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা বেদের শাসনানুযায়ী যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ইত্যাদির সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। সুতরাং বৈদিক মন্ত্র বা ক্রিয়া কিরূপে ফলপ্রসূ হইবে?

এইসব নানা কারণে কলিযুগে বিশেষতঃ কলি প্রবল হওয়ার পর আগম শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মানিয়া চলা ছাড়া অন্য গতি নাই।

পঞ্চ 'ম' কার সাধনা

তন্ত্রমতে পঞ্চ 'ম' কার সাধনা ধর্ম্ম-সাধনা। অনেকেই ইহার গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন—ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়।

তন্ত্রশাস্ত্র এই সাধনার উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই সাধনা একমতে তিন প্রকার—তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক; অন্যমতে দুইপ্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম, অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের সাধনা। তন্ত্রে ইহা পঞ্চতত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। প্রবৃত্তি মার্গের রাস্তা ধরিয়া ক্রমে ক্রমে সাধনায় উন্নতি লাভ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে আরোহণই তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য। তন্ত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী

লইয়া রচিত। যার ফলে সাধারণ মানুষের কামনা বাসনাকে নিন্দা বা পাশ কাটানোর কোন প্রয়াস নাই। তন্ত্রমতে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে শিব ও শক্তির প্রতীক। একে অন্যের পূরক।

পঞ্চ 'ম' কার—(১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মৎস্য, (৪) মুদ্রা, এবং (৫) মৈথুন। এই পাঁচ শব্দের আদ্যাক্ষর 'ম' বলিয়া পঞ্চ 'ম' কার বলা হয়। যাঁহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন, তাঁহারা বাহ্য পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা করিয়া থাকেন। ইহাতে অবশ্য আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব নয়। তবে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ নিয়া অভ্যাস করিলে অচিরেই সাধক নিবৃত্তি মার্গে উন্নীত হইবেন—উহাকেই সাত্ত্বিক বা সূক্ষ্ম সাধনা বলা হয়।

স্থূল পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা পার্থিব প্রলোভনের বস্তু নিয়া সম্পাদিত হয়। এই পার্থিব বস্তুগুলি আপাতদৃষ্টিতে মানুষের নৈতিক অবনতির কারণ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের কণ্টকস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। বিষের দ্বারা বিষক্ষয় যেমন সম্ভব, তদ্রূপ প্রলোভনের পার্থিব ভোগ্যবস্তুগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবর্তিত পঞ্চ 'ম' কারের সাধনায় মানুষ অমৃত্ব লাভ করিয়া থাকে। সমর্থ গুরু উপযুক্ত আধারের শিষ্যকে পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা দ্বারা পশুভাব হইতে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া থাকেন। ভোগ্যবস্তুর ভোগের ভিতর দিয়া জীবের ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া থাকেন।

মদ্য বলবীর্যের প্রতীক। মাংস এবং মৎস্য যাবতীয় ভূচর ও জলচর প্রাণীর প্রকাশক। মুদ্রা যাবতীয় উদ্ভিদের দ্যোতক। ইহা আবার অন্তরের কামনা বাসনাকে বশে আনিতে সাহায্য করিয়া থাকে। মৈথুনে আছে সৃষ্টিজনিত সুখ বা আনন্দ। ইহার চেয়ে বেশী আনন্দ বিশ্বসংসারে আর কিছু নাই। তাই সৃষ্টির আনন্দই পরমানন্দের স্বরূপ। এই পঞ্চ উপচার বিধিবদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিয়ার ভিতর উপভোগ করতঃ রাগ দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া দিব্যভাবের সাধক 'কৌল' উপাধি ধারণ করেন।

আনন্দ স্বরূপতঃ ব্রহ্মানন্দ। তাহা দেহের মধ্যে অবস্থিত।

শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্বের সেবায় কামাদি লোপ পায় এবং পঞ্চতত্ত্ব সেবাজনিত আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ এই অনুভূতি ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। এই ব্রহ্মোপলব্ধির অর্থ জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়া—ইহাকে মোক্ষলাভ বলা হয়। জলবিম্ব যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্ব সেবা দ্বারা সাধক পরমাত্মায় লীন হন। তন্ত্রে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে সদ্‌গুরু এবং কুলশাস্ত্র হইতে সম্যক্ অবগত হইয়া সাধককে পঞ্চ 'ম' কারের সেবা করিতে হইবে, নতুবা তাহার পতন ঘটিবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ 'ম' কার সহযোগে সাধনা তন্ত্রমতে ধর্ম্মসাধনা বলিয়া শাস্ত্রের যথানির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী আচরণ করিতে হইবে, তদন্যথায় লোভপরবশ হইয়া পঞ্চতত্ত্বের সেবায় ইষ্টের বদলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য পঞ্চ 'ম' কার সেবা দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা অতিশয় কঠিন সাধনা। বিশুদ্ধ চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, অদ্বৈতপরায়ণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্ব সাধনার অধিকারী। তন্ত্রে আরও আছে—যে সব দ্রব্যের দ্বারা পতন হয়, সেইসবের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, যদি সাধক নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্র মানিয়া ক্রিয়া করেন। কিপ্রকার শাসনের মাধ্যমে পঞ্চ 'ম' কার যোগে সাধনার ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, পাঠকবৃন্দ একবার তাহা ভাবিয়া দেখুন।

"যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষক নাশয়তে রুজম্॥"

যে কালকূট বিষ দ্বারা প্রাণী সকলের জীবন নাশ হয়, উপযুক্ত চিকিৎসক সেই কালকূট বিষ প্রয়োগ করিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূলভিত্তিও অনুরূপ। যাহা দ্বারা যে রোগ জন্মে তাহা দ্বারাই সেই রোগ নাশ করিতে হয়। "সমঃ সমং শময়তি" অর্থাৎ সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন দ্বারা যে যে লক্ষণ উৎপন্ন হয়, পীড়িত দেহে সেই সেই লক্ষণ সৃষ্ট হইলে, সূক্ষ্ম মাত্রায় সেই ঔষধ প্রদান করিলে সেই সকল উপজাত লক্ষণ দূরীভূত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে

"বিষস্য বিষ মহৌষধম্", 'বিষে বিষক্ষয়' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে এই বাক্যগুলি প্রণিধানযোগ্য।

এখন ভাবনার বিষয়—জগতে মানুষ কিসের দ্বারা ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, নিতান্ত অপদার্থ এবং সকলের হেয় হয়?

উত্তর—মদ্য ও রমণী (মাংস, মৎস্য এবং মুদ্রা সহায়কারী)।

মদ্য বা রমণীর মোহিনী শক্তি এতই প্রবল যে মানুষ ইহার আকর্ষণে অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত হয়, যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তন্ত্রের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অব্যর্থ এবং আশু ফলপ্রদ। যাহার মদ্যপিপাসা বা পরনারী সঙ্গমের প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এই চিকিৎসার ফলে অল্পকালের মধ্যে ইহা বিদূরিত হয়। তবে চিকিৎসক (এক্ষেত্রে গুরু বা ভবরোগের বৈদ্য) খুবই উচ্চমানের হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিষ নিয়া কাজ সহজ নয়। তাই তন্ত্রে আছে খড়্গের উপর দিয়া চলা এবং বাঘের কণ্ঠ আলিঙ্গন করার চাইতে কুলাচার পথ অত্যন্ত কঠিন। ইহা পঞ্চ 'ম' কার সাধনার একটি লৌকিক যুক্তি মাত্র। এই সম্পর্কে আধ্যাত্মিক যুক্তি পরিজ্ঞাত হইলে পঞ্চ 'ম' কার বা পঞ্চতত্ত্ব সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"
"কাম্যবস্তু উপভোগে কামনার নহে অবসান,
ঘৃতাহুতি লভি অগ্নি বাড়ে শুধু, লভে না নির্ব্বাণ।"

ভোগ্যবস্তুর ভোগ দ্বারা কখনও ভোগ লালসার নিবৃত্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে অগ্নি যেরূপ সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, উপভোগ দ্বারা ভোগ-লালসাও তদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিষ পান করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য—এই সত্য সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু চিকিৎসক কর্তৃক যে বিষ প্রয়োগ করা হয়, তাহার মধ্যে এরূপ চমৎকার উপায় আছে যে উহা দ্বারা দেহস্থ বিষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পঞ্চতত্ত্ব সাধনার ফলে সাধকের অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ

হইয়া থাকে। গুরু কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মদ্যাদিরূপ বিষ দ্বারা সংসার-বিষ হরণ করান তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে তন্ত্রে নিষেধ আছে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতিরেকে অপর কেহই সেই আধ্যাত্মিক যুক্তি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন।

প্রকৃত কুলাচারী মাতাল বা লম্পট নহেন। তাঁহারা স্ত্রীলোককে স্বীয় জননী বা ইষ্টদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকাশ্য-ভাবে প্রণাম করিয়া থাকেন।

পঞ্চ 'ম' কার তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিযা, অনেকে ইহার অপব্যাখ্যা, নিন্দা এবং অপপ্রচারে সোচ্চার হওয়ার ফলে বহুলোক বিভ্রান্ত হইয়াছেন। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"They teach the doctrine of eating of meat, the drinking of spirits and promiscuous sexual intercourse"—এই উক্তিটি কি প্রকার অজ্ঞতাপ্রসূত, একবার ভাবিয়া দেখুন।

আবার একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"Desire itself, subjected to rigorous discipline, is used to conquer desire"—মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

তন্ত্রে আছে, শক্তিসাধনা যেমন যাদুবিদ্যা নহে, তেমনি ইহা রসনা-তৃপ্তি বা দৈহিক ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার আশ্রয় বলিয়া ভাবনা করা মহাপাপ।

পঞ্চ 'ম' কারের সাধনাকে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা বলা হয়। বিষয় বস্তু সম্যক্ উপলব্ধির জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

(১) **আদ্য তত্ত্বের লক্ষণ**—যাহা জীবগণের মহৌষধ স্বরূপ, যাহা দ্বারা জীবগণ দুঃখরাশি বিস্মৃত হইয়া থাকে এবং যাহা সেবনে জীবগণ আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ইহা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পন্থায় শোধন না করিলে, ভ্রম এবং মোহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; কখনও বিষাদ এবং রোগের কারণ হইয়া থাকে। ইহাই মদ্য তত্ত্ব।

(২) **দ্বিতীয় তত্ত্বের লক্ষণ**—গ্রাম্য ছাগাদি, খেচর বিহঙ্গম, মৃগাদি পশুর দেহ হইতে উৎপন্ন পুষ্টিকর, বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ। ইহাই মাংস তত্ত্ব।

(৩) **তৃতীয় তত্ত্বের লক্ষণ**—যাহা জলোদ্ভব, সুখপ্রদ, প্রজনন-শক্তি বর্দ্ধক। ইহার নাম মৎস্য তত্ত্ব।

(৪) **চতুর্থ তত্ত্বের লক্ষণ**—যাহা ভূমি হইতে অনায়াসে সমুৎপন্ন, যাহা জীবগণের জীবনস্বরূপ এবং যাহা ত্রিজগতে মূল কারণ। ইহা মুদ্রা তত্ত্ব নামে অভিহিত।

(৫) **শেষ তত্ত্বের লক্ষণ**—যাহা জীবগণের অতীব আনন্দকর, যাহা প্রাণীদের সৃষ্টির কারণ এবং যাহা আদ্যন্তরহিত মায়াময় জগতের মূল কারণ—শক্তি সঙ্গম। ইহা মৈথুন তত্ত্ব বা শেষতত্ত্ব নামে পরিচিত।

স্থূল বা প্রবৃত্তিমার্গের পঞ্চ 'ম' কারের বর্ণনা উপরে লিপিবদ্ধ হইল। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার যে মদ্যাদি সেবনের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম নহে। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্ম লাভ। পঞ্চ তত্ত্বের ক্রিয়ার সময় অন্তরে যে ভাব পোষণ করা হয়, তাহাই উচ্ছ্বসিত হইয়া মনের একাগ্রতা বাড়ে, যার ফলে সাধনপথে ক্রমোন্নতি ঘটে এবং অভ্যাস যোগের সাহায্যে সাধক অচিরে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকেন।

এখন আমরা পঞ্চ 'ম' কার সাধনা, যাহা তন্ত্রশাস্ত্র সূক্ষ্ম বা নিবৃত্তি মার্গের সাধকের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মদ্য সাধন তত্ত্ব (সূক্ষ্ম)

পঞ্চ 'ম' কার বা পঞ্চ তত্ত্বের আদি তত্ত্ব মদ্য সাধন। যোগীরা বলেন—**"ব্রহ্মাকে কমণ্ডলমে হরিকে চরণসে পানি গিরতা হ্যায়—এহি হয় কারণ বারি।"**

হরির চরণ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে জল পড়িতেছে—তাহাই কারণ বারি। ব্রহ্মার কমণ্ডলু অর্থাৎ তালুরন্ধ্র। হরির চরণ অর্থাৎ

সহস্রার। অতি সহজ অর্থ এই যে সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা তালুরন্ধ্রে ঊর্দ্ধ জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়ে, তাহাই কারণবারি। ইহা পান করিলে অমর হওয়া যায়।

তন্ত্রে আছে—**"সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ বরাননে।**
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ ॥"

হে বরাননে, ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, তাহা পান করিয়া যিনি আনন্দিত হন, তাঁহাকে মদ্যসাধক কহে। সাধক এই কারণবারি পান করিয়া ভগবৎ নেশায় মাতিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে আরও উল্লেখ আছে—

"পীত্ব পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতং ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
যাতায়াতং ত্রিভিঃ কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

মূলাধারে ধরাতল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধে শিরস্থিত অধোমুখ কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবের সহিত সমাসক্তা কুণ্ডলিনী, তাহাতে শ্বেত লাক্ষারসসম গলিত সুধা পান করিয়া পুনরায় ধরাতলে অর্থাৎ মূলাধার চক্রে নামিয়া আসিবে। এই প্রকারে তিনবার উঠানামা করিয়া তৎসুধা পান করিলে আবার জন্ম নিতে হয় না। ইহাকে কুলাচার কহে। অন্যথায় সুরাপানে অবশ হইয়া একবার উপরের দিকে উঠা এবং পরক্ষণে মাটিতে পড়িয়া যাওয়াকে কুলসাধনা বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে কি সুন্দর নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে—তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

"মন্ত্রার্থ স্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।
অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ ॥"

মন্ত্রাথ ও দেবতার স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত এবং ব্রহ্মভাব উদ্ভবের জন্য যথানিয়মে অর্থাৎ শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী মদ্যপান করিবে, তদন্যথায় লোভবশতঃ মদ্যপান করিলে নিরয়গামী হইবে।

মাংস সাধন তত্ত্ব (সূক্ষ্ম)

পঞ্চ তত্ত্বের দ্বিতীয় তত্ত্ব মাংস সাধন। তন্ত্রে আছে—

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক ॥"

মা শব্দে রসনা বুঝায়। 'রসনার অংশ বাক্য। ইহা রসনার অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি রসনাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ বাক সংযম করেন, তাহাকে মাংস সাধক বলা হয়। গুরু হইতে উপদেশ নিয়া তালুমূলে জিহ্বাকে প্রবেশ করাইলে কথা বলা যায় না। জিহ্বার সংযম অভ্যাস করিলেই বাক্ সংযম আয়ত্ত হয়। প্রকৃত মাংস-সাধক বাক্ সংযমী যোগী।

মৎস্য সাধন তত্ত্ব (সূক্ষ্ম)

পঞ্চ 'ম' কার সাধনার তৃতীয় তত্ত্ব মৎস্য সাধন। তন্ত্রে আছে—

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ ॥"

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে দুইটি মৎস্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। যে সাধক সেই মৎস্য ভক্ষণ করেন, তিনি মৎস্য সাধক। গঙ্গা ইড়া নাড়ী এবং যমুনা পিঙ্গলা নাড়ী—এই দুই নাড়ীর মধ্যে সর্ব্বদা যে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে তাহাই মৎস্য। যে সাধক প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা দুই মৎস্যকে স্থির করেন—তিনি প্রকৃত মৎস্য সাধক। সহজ কথায় বলা যায় শ্বাস-প্রশ্বাসই দুইটি মৎস্য। যিনি প্রাণায়ামের সাহায্যে কুম্ভকের পুষ্টি সাধন করেন—তিনিই সত্যিকারের মৎস্য-সাধক।

মুদ্রা সাধন তত্ত্ব (সূক্ষ্ম)

পঞ্চ 'ম' কার সাধনার চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রা সাধন।

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতশ্চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ

সূর্য্য-কোটি-প্রতীকাশচন্দ্র-কোটি-সুশীতলঃ
অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনী-যুতঃ।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।।"

শিরস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে নির্ম্মল পারদের ন্যায় আত্মার অবস্থান। তাঁহার তেজঃ কোটি সূর্য্যের ন্যায়, কিন্তু স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্র তুল্য। এই আত্মা অতীব কমনীয় মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত। গুরু উপদেশে যে সাধক এই পরম পদার্থকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন—তিনিই প্রকৃত মুদ্রা সাধক।

মৈথুন সাধন তত্ত্ব (সূক্ষ্ম)

পঞ্চ 'ম' কার সাধনার পঞ্চম বা শেষ তত্ত্বই মৈথুন তত্ত্ব।

"আনন্দাদ্ধোব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব একটি আনন্দঘন দ্যোতনায়। এই যে আনন্দ, আনন্দঘন সত্তা এবং আনন্দময় পুরুষ—এই তিনই এক, আবার একই তিন। এই আনন্দঘন পুরুষ তাঁহার দ্যুতিতে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সকল তত্ত্বকে দ্যুতিমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাই তিনি 'আনন্দ' এবং স্বপ্রকাশ। বিশ্বসার তন্ত্রের অন্তর্গত গুরুগীতা স্তোত্রে বলা হইয়াছে তিনি 'আনন্দমানন্দকরং' অর্থাৎ তিনি নিজে আনন্দময় এবং (ভক্তের) আনন্দবর্দ্ধনকারী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্থূল মৈথুনে আছে সৃষ্টিজনিত সুখ বা আনন্দ, যাহার চেয়ে বেশী আনন্দ সংসারে আর নাই। এই জন্যই ইহাকে পরমানন্দের স্বরূপ বলা হইয়াছে।

"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম।।"

মৈথুন তত্ত্বই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ। মৈথুন দ্বারা সিদ্ধি এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

শাস্ত্রে আরও আছে "নাভিচক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে আরক্তবর্ণ 'র' কারের (তেজস্তত্ত্বের) সহিত অজপারূপ শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনি বা ব্রহ্মযোনির মধ্যে বিন্দুরূপ 'ম' কারের মিলন হয়, তখন মহানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। উর্দ্ধে এইরূপ স্থিতি হইলে যে স্থির অবস্থার উদয় হয়, সেই অবস্থায় রমণ করার নাম 'রাম'। ইহাই প্রকৃত রাম নাম—যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। এই আত্মতত্ত্বরূপ মৈথুন তত্ত্বই পরম তত্ত্ব।"

."যেরূপ মৈথুনকার্য্যে আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপন, রমণ এবং রেতোৎসর্গ—এই ছয়টি অঙ্গ, আধ্যাত্মিক মৈথুনেও ছয়টি অঙ্গ আছে। যোগক্রিয়ার তত্ত্বাদিন্যাসের নাম আলিঙ্গন, ধ্যানের নাম চুম্বন, আবাহনের নাম শীৎকার, নৈবেদ্যের নাম অনুলেপন, জপের নাম রমণ এবং দক্ষিণান্তের নাম রেতঃপাতন। ফলকথা, ষড়ঙ্গযোগে এইরূপ ষড়ঙ্গ সাধন করার নাম মৈথুন সাধন।"

সূক্ষ্ম পঞ্চ 'ম' কারের সাধন পদ্ধতি সদাশিব কথিত যোগশাস্ত্রে বর্ণিত এবং স্থূল পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা একই সদাশিব কর্তৃক তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সূক্ষ্ম পঞ্চ 'ম' কার সাধনা নিবৃত্তি মার্গের সাধকবৃন্দের জন্য রচিত। নিবৃত্তির পথই যোগের পথ।

স্থূল পঞ্চ 'ম' কার সাধনা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্থূল পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা প্রবৃত্তি মার্গের সাধকদের জন্য রচিত। প্রবৃত্তি ভোগের পথ। যাহারা ভোগাসক্ত, তাহারা সূক্ষ্ম পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং অসমর্থ। তাই তন্ত্রশাস্ত্র তামসিক ও রাজসিক ভাবাপন্ন জীবের কল্যাণার্থ স্থূল পঞ্চ 'ম' কার সাধনার প্রবর্তন করিয়াছেন। ভোগাসক্ত জীবকে ভোগ্যবস্তুর মাধ্যমে নিবৃত্তির পথে নিবার জন্য স্থূল সাধনা একটি কৌশল মাত্র। কারণ, যাঁহারা

ভোগের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলেও তাঁহারা আপন স্বভাব-বৃত্তি ত্যাগ করিবেন না। তাই ভোগ্য বস্তুসহ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহাদের মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা স্থূল সাধনা দ্বারা করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ পালন করিলে ভোগাসক্ত জীব অল্পকালের মধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে উন্নীত হইতে পরিবেন।

স্থূল পঞ্চ 'ম' কার সাধনার বিস্তৃত পদ্ধতি 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' সহ অন্যান্য বিভিন্ন তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, মদ্যকে মন্ত্রপূত এবং সংস্কৃত করিলে উহা তেজোধর্ম্মী হয়; তারপর পান করিলে কুণ্ডলিনী শক্তির মুখে পড়ার পর তাঁহার জাগরণের সহায়ক হয়। আবার মদ্য কতখানি পান করা উচিত, সেই সম্বন্ধে নির্দ্দেশ শাস্ত্রে আছে। অধিক পানের ফলে মদ্যপায়ীর হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়া মনুষ্যত্বের লোপ হয়, তাই মদ্য পান সম্পর্কে কঠোর বিধি-ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থায় বিষ প্রয়োগের সাহায্যে রোগীর বিষক্ষয় হইয়া থাকে; তদ্রূপ উপযুক্ত গুরুর উপদেশ অনুযায়ী মদ্যপান করিলে অচিরে মন্ত্র চৈতন্য তথা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ সম্ভব হয়। তন্ত্রে আছে পূজা সমাপন করিয়া নিবেদিত মদ্য মূলাধার হইতে জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীর চিন্তা করিয়া সুষুম্না পথে যোনি মুদ্রার সাহায্যে ঢালিয়া দিতে হয়, যার ফলে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ সম্ভব হয়। এই ক্রিয়া সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করা দরকার।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ তত্ত্ব যথাক্রমে মাংস, মৎস্য এবং মুদ্রা মুখ্যতঃ প্রথম এবং পঞ্চম তত্ত্বের সহায়কারী। ইহাদের লক্ষণাদির আলোচনা প্রথমদিকে করিয়াছি। এখন পঞ্চম তত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন।

তন্ত্র মতে কলিযুগে বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অন্য শক্তি নিয়া সাধনা করা উচিত নয়। এমনকি স্বীয় পত্নী নিয়া সাধনায় বিধি ভঙ্গ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী—এইরূপ উক্তি তন্ত্রে আছে।

শেষ তত্ত্ব মৈথুনের আকাঙ্ক্ষা জীব মাত্রের অন্তরে বিদ্যমান। ইহা ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব। তাই তন্ত্রের উপদেশ রমণীত্বকে জননীত্বে পরিণত করিলে রমণীর আকর্ষণ এড়ান সম্ভব। একমাত্র শক্তিসাধনা দ্বারা প্রকৃতির মোহিনী বা আকর্ষণী শক্তিকে জয় করা যায়। এই সাধনার গতি-প্রকৃতি সমর্থ গুরু হইতে জ্ঞাত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার নির্দ্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। সহজ কথায় প্রকৃত কৌল সাধক পঞ্চম তত্ত্বের সাধনার যোগ্য অধিকারী। তদন্যথায় সাধক মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন—যাহা হইতে উদ্ধার লাভ সুদূরপরাহত। পঞ্চম বা শেষ তত্ত্বের বিষয়বস্তু গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া উপযুক্ত অধিকারী ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব

তত্ত্ব বলিতে বিশ্বের স্তর সমূহকে বুঝায়, যাহা সর্ব্বকালে বিশ্বের সহিত বর্ত্তমান। চিত্ত এই তত্ত্ব ধরিয়া চলে এবং তত্ত্বাতীতে সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্র মতে শব্দব্রহ্ম ছত্রিশটি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সাংখ্য-দর্শন মতে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। অতএব সাংখ্যমতের পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের উপর তন্ত্রের প্রতিপাদ্য আরও একাদশ তত্ত্বযোগ করা হইয়াছে। সবগুলি তত্ত্বের নামকরণ এইরূপ ঃ—

প্রথম হইতে পঞ্চম তত্ত্ব (১-৫) পঞ্চ স্থূল মহাভূত।

ষষ্ঠ হইতে দশম তত্ত্ব (৬-১০) পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্রা।

একাদশ হইতে বিংশতি তত্ত্ব (১১-২০) দশেন্দ্রিয় তত্ত্ব।

একবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব (২১-২৩) মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিতত্ত্ব।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব (২৪) ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তত্ত্ব।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (২৫) ত্রিগুণ পুরুষ তত্ত্ব।

ষড়্‌বিংশতি হইতে একত্রিংশৎ তত্ত্ব (২৬-৩১) (ক) নিয়তি (কর্ম্মফলে জন্মান্তর), (খ) কাল (মৃত্যু), (গ) রাগ (অতৃপ্তি), (ঘ) কলা (খণ্ডজ্ঞান), (ঙ) বিদ্যা (জাগতিক জ্ঞান) এবং (চ) মায়া (ভ্রান্ত জ্ঞান) তত্ত্ব।

দ্বাত্রিংশৎ তত্ত্ব (৩২) শুদ্ধ বিদ্যা তত্ত্ব

ত্রয়স্ত্রিংশৎ তত্ত্ব (৩৩) ঈশ্বর তত্ত্ব।

চতুঃত্রিংশৎ তত্ত্ব (৩৪) সদাশিব তত্ত্ব।

পঞ্চত্রিংশৎ তত্ত্ব (৩৫) শক্তি তত্ত্ব।

ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব (৩৬) শিব তত্ত্ব।

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ নাই। কিন্তু তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্যযুক্ত এবং পরিশেষে অদ্বৈত। দেহবদ্ধ জীবের ১-৩১ তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব বা মায়াতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব শেষতত্ত্ব।

শৈবাগম সম্মত কলা সকল পরাশক্তির কার্য্য। তাহারা পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা—(১) নিবৃত্তি, (২) প্রতিষ্ঠা, (৩) বিদ্যা, (৪) শান্তি এবং (৫) শান্তাতীত। পরাশক্তি ব্যতিরিক্ত সদাশিবাদি ৩৫টি তত্ত্ব এই কলা সকলে আশ্রিত।

পরাশক্তি বা বিন্দুকে এবং পরাশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত পদার্থসকলকে তত্ত্ব বলা হয়। শৈবাগমের মতে ইহাদের সংখ্যা ছত্রিশ (৩৬)। ইহারা এইরূপ ঃ—(১) পরাশক্তি, (২) শক্তি, (৩) সদাশিব, (৪) মহেশ্বর, (৫) শুদ্ধবিদ্যা, (৬) অপরামায়া, (৭) কাল, (৮) নিয়তি. (৯) কলা, (১০) বিদ্যা, (১১) রাগ, (১২) পুরুষ, (১৩) অব্যক্ত, (১৪) বুদ্ধি, (১৫) অহঙ্কার, (১৬) মন, (১৭-২১) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (২২-২৬) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, (২৭-৩১) শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা এবং (৩২-৩৬) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত।

দশ মহাবিদ্যা


কালী

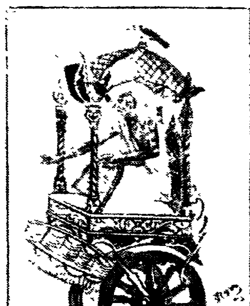

তারা


ষোড়শী


ভুবনেশ্বরী


ভৈরবী


ছিন্নমস্তা


ধূমাবতী


বগলামুখী


মাতঙ্গী


কমলাত্মিকা

দশ মহাবিদ্যা

> "কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
> ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
> বগলা সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
> এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"
>
> —চামুণ্ডা তন্ত্র।

মহাবিদ্যা ঃ—(১) কালী এবং (২) তারা।

বিদ্যা ঃ—(৩) ষোড়শী, (৪) ভুবনেশ্বরী, (৫) ভৈরবী, (৬) ছিন্নমস্তা এবং (৭) ধূমাবতী।

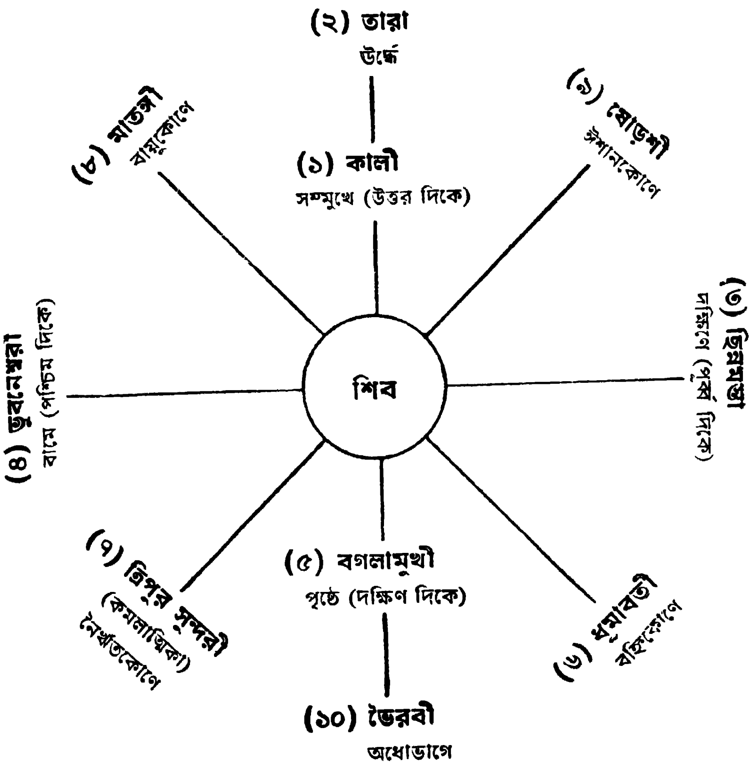
সিদ্ধবিদ্যা ঃ—(৮) বগলা, (৯) মাতঙ্গী এবং (১০) কমলাত্মিকা।

"ইহারা মহাশক্তির পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি। তন্ত্রশাস্ত্র মতে মহাশক্তির বিভূতির নাম 'মায়া' এবং রজস্তমোগুণ প্রধান অংশের নাম 'অবিদ্যা'। শুদ্ধ সত্ত্বগুণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ পর্য্যন্ত অবস্থার নাম 'বিদ্যা'। মনের তত্ত্বজ্ঞানাত্মক অবস্থাকে বিদ্যা বলা যাইতে পারে। বিদ্যার মধ্যে যিনি তত্ত্বাতীতা তুরীয়া শক্তি, কেবলমাত্র যাঁহার স্বরূপ সত্ত্বা—তিনিই 'মহাবিদ্যা'। সহজ কথায় বলা যায় যে 'বিদ্যা' বলে যাঁহাকে লাভ করা যায়, তিনিই 'মহাবিদ্যা'।"

আবার 'শ্যামা রহস্যে' সকলকে মহাবিদ্যা বলা হইয়াছে। সাধকের কাছে 'সিদ্ধবিদ্যা', 'বিদ্যা' এবং 'মহাবিদ্যার' সমন্বয় পরিস্ফুট হয়।

দক্ষ কর্ত্তৃক আয়োজিত যজ্ঞে শিব আমন্ত্রিত না হওয়ায় সতীর মনে খুব দুঃখ হয়। দাক্ষায়ণী পিতাকে বুঝাইয়া সুমীমাংসার উদ্দেশ্যে শিবের কাছে পিত্রালয়ে যাইবার জন্য বারংবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথা হন। শিবের মধ্যে পতি-পত্নীভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার (শিবের) অভিমান চূর্ণ করার মানসে দাক্ষায়ণী ভীম-ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শঙ্করকে মোহাক্রান্ত করিলেন।

দেবীর ভীমবদনে অট্টহাস্যরবে মোহাক্রান্ত শঙ্কর ভীতিবিহ্বল হইয়া পলায়নপর হইলেন।



দশদিকে ধাবমান হইয়া ভয়শূন্য পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন দেবী দক্ষিণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শঙ্করকে মা ভৈঃ রবে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"পিতা দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ এবং ভীতি উৎপাদন করার মানসে তোমার দশদিক্ বেষ্টন করিয়া আমার মহাভীমা দশমূর্ত্তি। তুমি মহাজ্ঞানী—জ্ঞান নেত্রে আমার স্বরূপ দর্শন কর।" তৎপর শঙ্করের কৌতূহল নিবারণের জন্য দশদিগন্তে আবির্ভূতা মহাভয়ঙ্করী দশমূর্ত্তির একে একে পরিচয় দিতে লাগিলেন :—

"তোমার সম্মুখভাগে যে ভীমলোচনা কৃষ্ণবর্ণা মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ আমিই সেই কালী (১), তোমার ঊর্দ্ধে শ্যামবর্ণা মহাকালস্বরূপিণী

মহাবিদ্যা তারা (২) বিরাজিতা। তোমার দক্ষিণে শীর্ষহীনা অতি ভয়ঙ্করী দেবী ছিন্নমস্তা (৩), আর বামভাগে দেবী ভুবনেশ্বরী (৪) অবস্থিতা। তোমার পৃষ্ঠভাগে শত্রুসংহারকারিণী দেবী বগলামুখী (৫), অগ্নিকোণে বিধবা রূপধারিণী দেবী ধূমাবতী (৬), নৈঋ́ত কোণে দেবী ত্রিপুর সুন্দরী (কমলাত্মিকা) (৭), বায়ুকোণে দেবী মাতঙ্গী (৮), ঈশানকোণে ষোড়শী (৯), এবং অধোভাগে দেবী ভৈরবী (১০) অবস্থিতা।

"শম্ভো! ভবভয়হারিণী আমার এই দশবিধ বিভূতিমূর্তি দর্শন করিয়া ভীত হইও না। আমার বহুমূর্ত্তির (নবকোটি বিভূতিমূর্ত্তি) মধ্যে এই দশ মহাবিদ্যা মূর্ত্তিই প্রকৃষ্টা (পূর্ণবিভূতি) বলিয়া জানিবে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ইহাদিগকে ভজনা করে, সেই সকল ভক্ত সাধক-বৃন্দের পক্ষে ইহারা নিয়ত চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা। মহেশ্বর! মারণ, উচ্চাটন, ক্ষোভণ, মোহন, দ্রাবণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ প্রভৃতি যাহাকিছু সাধকগণের অভিপ্রেত, সে সমস্ত অভীষ্ট ইহারা প্রদান করেন। এই দশমহাবিদ্যা সকলেই গোপনীয়া। ইহাদিগের মন্ত্র, যন্ত্র, পূজা, হোম, পুরশ্চরণ, স্তোত্র, কবচ, আচার, নিয়ম ইত্যাদি যাহা কিছু সাধকগণের প্রয়োজনীয় তুমিই তাহার বিধান ব্যাখ্যা করিবে—জগতে তাহার অন্য বক্তা নাই।"

['মহাভাগবত', 'দশমহাবিদ্যা উপাসনা রহস্য' এবং 'তন্ত্রতত্ত্ব' অবলম্বনে লিখিত]

দশমহাবিদ্যার রহস্য আমাদের দেহতত্ত্বের সঙ্গে অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আমাদের দেহে নয়টি (৯) রন্ধ্র আছে—যাহা নবদ্বার নামে পরিচিত। ইহার সাতটি মস্তকে অবস্থিত; যথা—দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখগহ্বর। বাকী দুইটি পায়ু এবং উপস্থ নামে পরিচিত। আর দশমদ্বার সহস্রারে ব্রহ্মনাড়ীর মুখ—যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র নামে অভিহিত।

উপরোক্ত দশটি রন্ধ্রের দশজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী দশমহাবিদ্যা নামে তন্ত্রসাধকদের কাছে সমাদৃতা। দেহরন্ধ্রে তাঁহাদের অবস্থান

নিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাউক। কারণ এইসব রন্ধ্রপথেই আমাদের অন্তরস্থিত শক্তির বিকাশ হয়। সাধন পথে দক্ষিণ কর্ণের গুরুত্ব খুব বেশী। গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্রদান করেন। সাধক নাদধ্বনি শ্রবণ করেন দক্ষিণ কর্ণের মাধ্যমে। কালীর অক্ষমালা জপের বিধান 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে যাওয়া। শাস্ত্রে কালী দক্ষিণা নামে উল্লিখিত হওয়ায় আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি যে দক্ষিণা-কালীই দক্ষিণ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আবার 'তারার' অক্ষমালা জপের বিধান কালীর বিধানের বিপরীত। এই পদ্ধতি 'ক্ষ' হইতে 'অ' পর্য্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামে যাওয়া। 'তারার' অপর নাম বামা—উহা সর্ব্বজনবিদিত। বামকর্ণেই ধ্বনিত হয় বিন্দু যাহার অবস্থান নাদের উপর। সুতরাং 'তারাই' যে বামকর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। শিশুদের প্রথম পাঠ অভ্যাস এই শ্রবণ শক্তির সাহায্যে; আবার সদ্যোজাত শিশুর শ্রবণ শক্তিই প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই শব্দ বা ধ্বনির কোন রূপ নাই। কালী তন্ত্রে আছে মা 'অবর্ণা এবং বর্ণরহিতা'। এই কারণে কালী এবং তারার প্রতিমা তৈয়ার করিয়া সমাজে পূজা প্রচলিত হয় নাই।

তারপর ষোড়শী এবং ভুবনেশ্বরী যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ষোড়শীর অপর নাম শ্যামা। তাঁহার রূপ নব-ঘনশ্যাম—দেখামাত্র যে রূপ অন্তরে পুলক জাগায়। ভুবনেশ্বরীর অন্য নাম জগদ্ধাত্রী। তাঁহার রক্তিম রূপের ছটায় বিশ্বভুবন আলোকিত এবং মানবচিত্ত আকৃষ্ট।

কালী, তারা, ষোড়শী এবং ভুবনেশ্বরী—এই চার দেবীর মানবদেহে অধিষ্ঠান প্রায় একই সরলরেখায়। ইহার সামান্য নীচে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী। প্রাণায়ামে প্রতিষ্ঠিত হইলে চক্ষু এবং কর্ণ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। এইরূপে

ইহারা কর্ণদ্বয় এবং চক্ষুদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদিগের সহায়িকার কাজ করিতেছেন।

নাসারন্ধ্রের নীচে মুখগহ্বরে বগলামুখীর অধিষ্ঠান। তাহার পরিচয় দেবীর রূপ কল্পনায় পরিস্ফুট। দেখা যায়, দেবী একহাতে অসুরের জিহ্বা আকর্ষণপূর্ব্বক অন্যহাতে (অসুরের) মাথায় মুদগর দ্বারা প্রহার করিতেছেন। দেবী বগলামুখীকে সাহায্য করিতেছেন পায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভৈরবী—যাঁহার অন্য নাম গুহ্যবাসিনী। তিনি সুষুম্না নাড়ীর বিকাশের পথ করিয়া দেন। সহজ কথায় ইহারা আমাদের আহার ও বাক্ সংযমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দেবী কমলার রূপকল্পনায় পাই—দেবীর দুইদিকে অবস্থিত দুইটি কুম্ভ হইতে দুইটি হস্তী অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। এই দুইটি কুম্ভ উপস্থের সন্নিকটবর্ত্তী দুইটি অণ্ড। তাই দেবী কমলা উপস্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহাকে সাহায্য করেন দেবী ছিন্নমস্তা, যিনি সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরুষের বীর্য্য মস্তিষ্ক হইতে উদ্দীপিত হইয়া তদীয় অণ্ডদ্বয়ে সঞ্চিত হয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে এই অধ্যায়ের প্রথমে চামুণ্ডা তন্ত্র হইতে চার লাইনের যে সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন সুর এবং তাল সংযোজনা ক্রমে দশমহাবিদ্যার অখণ্ড নাম সংকীর্তন উদয়াস্ত বা অহোরাত্র ব্যাপিয়া করিতে পারিলে মায়ের আনন্দ বর্দ্ধন হইবে। কুমারীদের দ্বারা উক্ত অখণ্ড নাম কীর্ত্তন হইলে মায়ের প্রীতি সম্পাদন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ষট্ কর্ম্ম

(১) শান্তি কর্ম্ম, (২) বশীকরণ, (৩) স্তম্ভন, (৪) বিদ্বেষণ, (৫) উচ্চাটন এবং (৬) মারণ—এইগুলি ষট্‌কর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) যে কর্ম্ম দ্বারা রোগ, কুকৃত্যাদি এবং গ্রহদোষ নিবারিত হয়, তাহাই **শান্তিকর্ম্ম** নামে অভিহিত।

(২) যে প্রণালী দ্বারা এক বা বহু ব্যক্তির বশ্যতা সাধন হয়, তাহাকে **বশীকরণ** বলে।

(৩) যে ক্রিয়া দ্বারা প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহাকে **স্তম্ভন** বলা হয়।

(৪) পরস্পর প্রণয়ীগণের মধ্যে দ্বেষজনক যে কার্য্য, তাহাই **বিদ্বেষণ** নামে প্রসিদ্ধ।

(৫) যে কাজ দ্বারা স্বদেশ হইতে ভ্রষ্ট করা যায়, তাহাকে **উচ্চাটন** বলে।

(৬) যে কার্য্য দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ হরণ হয়, তাহার নাম **মারণ**।

দিক্, দেবতা ও কালাদি জ্ঞাত হইয়া এইসব কর্ম্ম করিতে হয়। উচ্চস্তরের সাধক কখনও কোনপ্রকার অহিতকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন না। তন্ত্র-বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তব রূপদান করা। ইহা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদল স্বার্থান্বেষী ক্রিয়াবিদ্ তান্ত্রিক নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার এবং অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্যে তন্ত্রের নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভক্ত এবং বিষয়ী লোকদিগের কামনা-বাসনা পূর্ণ করেন; দুরারোগ্য ব্যাধি সারানো, শত্রুর অনিষ্টসাধন, মামলা মোকদ্দমায় জয়ী করান, বশীকরণ ইত্যাদি কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এইসব স্বার্থপর ব্যক্তিরা তন্ত্রের মহান্ আদর্শ ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের কথা ভুলিয়া মহান্ চিন্তাধারাকে পদদলিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। আমরা 'অভিচার' ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনায় অতি সংক্ষেপে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। সত্যিকারের তন্ত্রসাধক কখনও নিকৃষ্ট পন্থার প্রশ্রয় দিবেন না। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতেছি। বিষ দ্বারা মানুষের প্রাণনাশ হয়। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক আবার ঐ বিষেরই সাহায্যে কোন কোন রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন। তন্ত্রের উপরোক্ত ক্রিয়াগুলিও তদ্রূপ।

গ্রন্থি-ভেদ

মানবদেহে তিনটি মুখ্য গ্রন্থি আছে। এগুলি (১) **ব্রহ্মগ্রন্থি** (২) **বিষ্ণুগ্রন্থি** এবং (৩) **রুদ্রগ্রন্থি** নামে পরিচিত। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। বাক্, প্রাণ ও মন নিয়া ইহাদের কাজ। গ্রন্থিভেদের ক্রিয়া দ্বারা জীব আত্মস্থ হয়। সাধন জীবনে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য এই তিন গ্রন্থির ভেদ অপরিহার্য্য। গুরু-উপদিষ্ট হইয়া গ্রন্থিভেদের ক্রিয়াতে সফলকাম হইলে 'জানা-পাওয়া-হওয়া' তিনই লাভ হয়। তিনটি গ্রন্থিতে মায়াশক্তি কেন্দ্রীভূত থাকেন। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলকে অগ্নিখণ্ড বলে। এর উপরে ব্রহ্মগ্রন্থি অবস্থিত। মণিপুর ও অনাহত চক্রের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলকে বলা হয় সূর্য্যখণ্ড। ইহার উপরে বিষ্ণুগ্রন্থি। বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলকে বলা হয় চন্দ্রখণ্ড এবং ইহার উপরে আছে রুদ্রগ্রন্থি।

শাক্ত-দর্শন

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দর্শন সমুচ্চয়ে' বা 'সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে' শাক্ত দর্শন নামে কোন দর্শন নাই। সাধক চূড়ামণি শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত তন্ত্রসার গ্রন্থে ষোড়শী প্রকরণে 'শাক্তদর্শন' পূজার আধার চক্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রী শ্রী চণ্ডী, শ্রীবাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা এবং ঈশোপনিষদে শাক্তদর্শন পরিস্ফুট।

শক্তিবাদের মূল উৎস ঋগ্বেদীয় 'দেবী-সূক্ত'। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা দেবীরূপে আত্মদর্শন করিয়া মন্ত্র-দ্রষ্ট্রী হইয়াছিলেন। উপনিষদ্ বাক্য **'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** অর্থাৎ গোচরীভূত সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। যাবতীয় জড় এবং চেতন পদার্থকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রের বিরাট দান শক্তি তত্ত্ব। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে—এক মহাশক্তি। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে আছে—**"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"**। শক্তি উপাসনা বহুকাল হইতে প্রচলিত এবং ইহা তান্ত্রিকমতে সিদ্ধ। তন্ত্র, পুরাণ, বেদ-বেদান্ত সকলের সামঞ্জস্য এই

শাক্ত দর্শনে পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কযুক্ত অংশ বাদ দিলেও ইহাতে পরমেশ্বরীর কৃপাবাদের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমস্ত আস্তিক দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান ইহার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। শাক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যুগলমূর্ত্তির উপাসকদের কাছে ইহা সমভাবে উপযোগী

জ্ঞান ও জড়, চিৎ ও অচিৎ, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের নিত্য সম্মিলিত সত্ত্বা পূর্ণ অদ্বৈতরূপে প্রতিভাত। এই চিৎ এবং অচিৎ সমানভাবে একই ব্রহ্মে অবস্থিত। যেমন ধান্যের মধ্যে আছে তুষ ও তণ্ডুল, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি ব্রহ্মে বিদ্যমান। তুষ বা তণ্ডুল—একা কাহারো অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি নাই; কিন্তু এতদুভয়ের মিলিতরূপ ধান্যে তাহা আছে। সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্য মিলিত সত্ত্বাই ব্রহ্ম—**'একমেবাদ্বিতীয়ম্'**।

চিৎ এবং অচিৎ, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগকে ব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করা হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বাক্য **'বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্'** প্রণিধানযোগ্য। কারণ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের অবয়ব হইতে পারে না। অনুরূপভাবে চিৎ এবং অচিৎ অথবা পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবয়ব-অবয়বী ভাব নাই বা থাকিতে পারে না। চিৎ—অখণ্ড, নিত্য, ব্যাপক, নির্বিবকার, জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ। অচিৎ প্রকৃতিও নিত্য, সর্ব্বব্যাপক, কিন্তু সবিকার ও জড়। এই দুইটি সর্ব্বব্যাপকের নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও অবয়ব-অবয়বী ভাব নাই।

নিরাকার ব্রহ্ম কখন কখন সাকার হইতে পারেন। বৈদিক বর্ণনায় পাওয়া যায়—তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ ইত্যাদি। আবার পাই, তিনি যাহাকে বরণ করেন (কৃপা করেন) তাহার কাছে নিজ শরীর প্রকট করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জীবগণের শরীর বা ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় তাঁহার শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি নহে। এই শরীর ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ লীলাবিলাস ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহা তাঁহার ইচ্ছামাত্র পরিবর্ত্তনীয়। একই সত্ত্বা স্বরূপে নিরাকার এবং লীলায় সাকার।

বাহ্য পূজা

ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের নিমিত্ত তন্ত্রের একটি বড় অবদান—পূজার প্রবর্ত্তন। বৈদিক ধারায় ছিল শুধু যজ্ঞ। পূজাকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বলা যাইতে পারে। পার্থিব জগতে সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি ইত্যাদি লাভ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। তথাপি ওই পূজার মাধ্যমে সাধন জীবনের ক্ষেত্র অতি সুন্দরভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।

(এই সগুণের ঘরে নিগুণের উপাসনায় দুইটি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম প্রতিমা, দ্বিতীয় যন্ত্র। তিনি সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও প্রতিমাতে তাঁহার ব্রহ্মরূপের উপাসনা সহজসাধ্য। গাভীর দুগ্ধের উপাদান তাহার সর্ব্বাঙ্গে থাকিলেও পরিশ্রুত দুগ্ধ যেমন একমাত্র স্তনদ্বার হইতে লভ্য, তদ্রূপ দেবতা সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার স্বরূপসত্ত্বা প্রতিমাতে বিরাজিত।)

যন্ত্র দেবতার নিত্যাধিষ্ঠান ক্ষেত্র, যেহেতু ইহা মন্ত্রময়। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে যন্ত্র দেবতার মন্ত্রমূর্তির স্বরূপপ্রকাশ। যন্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সাধারণভাবে অপ্রকাশ্য। গুরু উচ্চস্তরের শিষ্যের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে যন্ত্রের তাত্ত্বিকদিক ব্যাখ্যা করতঃ ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন।

পূজার জন্য দেবালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, পূজায় ব্যবহৃত বাসন পরিষ্কার করা, যথানিয়মে বিল্বপত্র সংগ্রহ, পুষ্পচয়ন, নৈবেদ্যাদি তৈয়ার ইত্যাদি পূজার প্রাথমিক কাজ হইলেও, ইহার মধ্য দিয়া সাধন জীবনের মানসিক প্রস্তুতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

(শাস্ত্রানুযায়ী প্রস্তুত দেবতার প্রতিমাতে যথাবিধি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে, মন্ত্রশক্তি প্রভাবে ব্রহ্মচৈতন্য সঞ্চারিত হইলে মৃন্ময়মূর্ত্তিতে চিন্ময় সত্ত্বা পরিস্ফুট হয়। হৃদয়স্থ দেবতাকে মন্ত্রবলে হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা সমাপনান্তে আবার হৃদয়ে স্থাপন করাকে যথাক্রমে আবাহন ও বিসর্জ্জন বলা হয়)

মূল পূজার প্রণালী বা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলেই পাঠকবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন যে পূজা কিভাবে ঈশ্বর সান্নিধ্যের পথে পরিচালিত করে এবং একই সঙ্গে সাধন-জীবনকে এক সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়া থাকে; যার ফলে সাধক ক্রমে ক্রমে যথাকালে সাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারেন। বাহ্য-পূজা রাজসী হইলেও সর্ব্ব-সৌভাগ্যদায়িনী—ইহলোকে ভোগদায়িনী এবং অন্তে মোক্ষ-বিধায়িনী।

কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—

"দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাং।
কৃতার্চ্চনাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি॥"

দেবতার স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব এবং মন্ত্রের শক্তি যাহারা জানে না, তাহাদের কৃত অর্চ্চনাদি সবকিছুই ব্যর্থ হয়। আমাদের অনুষ্ঠিত পূজা কেন ফলপ্রসূ হয় না, তাহার কারণসমূহ উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সদাশিবের অভিপ্রায় এই যে কলি প্রবল হইলে পর যাবতীয় পূজা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত না হইলে ক্রিয়া ফলপ্রসূ হইবে না।

মন্তব্য ঃ—কলি প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় শত বৎসর হইতে চলিল।

মানস পূজা

মানস পূজায় বাহ্য উপচার লাগে না। প্রথমেই মায়ের সর্ব্বাঙ্গ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করতঃ মনে মনে একাদিক্রমে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় পর্য্যন্ত দান করিয়া মাকে মনোময় আবরণ এবং আভরণ দ্বারা সজ্জিত করিতে হয়। বিস্তৃত পদ্ধতি-রহস্য পূজার বিধিতে পাওয়া যাইবে।

মানস পূজাকে অন্তর্যাগও বলা হয়। দিব্যাচারী সাধক ইহার মুখ্য অধিকারী। তবে অন্যান্য উপাসক বাহ্য এবং আন্তর পূজা—

উভয়ের অভ্যাস অব্যাহত রাখিবেন, যার ফলে ভবিষ্যতে উপকৃত হইবেন। কারণ তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিবে যথাসময়ে শুদ্ধ, সত্ত্বগুণী অন্তর্যাগের যোগ্য অধিকারী হওয়া।

মানসপূজা মহাসিদ্ধিকরী ও মুক্তিদায়িনী। এই ক্রিয়া হইতে সাধকের জীবত্ব নাশ হইয়া শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে। কলুষিত, দূষিত বা বিকারগ্রস্ত মন নিয়া মানসপূজা সম্ভব নহে। যখন মন আমার হইবে, তখনই মানস পূজা সার্থক রূপ লইবে।

সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ সাধক রাজা রামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনাতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। দীক্ষাপ্রাপ্ত রাজা সাধনার প্রথমদিকে রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া নিভৃতে পূজামন্দিরে আপন সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। সেই সময় রাণী কাত্যায়নীর জন্য সোনার কঙ্কণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর রাণীর করদ্বয় কঙ্কণহীন লক্ষ্য করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলে রাণী বলিলেন যে কঙ্কণ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। পরদিবস রাজা যখন পূজাঘরে অবস্থিত, তখন একজন সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, 'রাজার হুকুম নাই' বলিয়া অতি বিনীতভাবে প্রহরীরা তাহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন যে পূজা সমাপনান্তে রাজা বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে যেন বলা হয়—"রাণীর কঙ্কণচিন্তা আর ইষ্টদেবতার পূজা এক নয়"। অতঃপর সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। পূজাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী প্রদত্ত খবর পাওয়া মাত্র রাজা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। তারপর বহু অনুসন্ধানেও সন্ন্যাসীর খবর পাওয়া গেল না।

এই ঘটনার পর হইতে রাজা রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাহাকে সব সময় অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এইভাবে তিন বৎসর অতীত হইল। রাজা যথা নিয়মে রুদ্ধদ্বার কক্ষে পূজায় নিমগ্ন। এমন সময় সেই সন্ন্যাসী আবার উপস্থিত হইলে প্রহরীরা সশ্রদ্ধ প্রণামান্তর তাঁহাকে পূজাগৃহের দরজার কাছে নিয়া গেল। রাজা তখন মায়ের সর্ব্বাঙ্গ চিন্তা করিয়া যথাবিধি মানস পূজায়

ব্যাপৃত। মাকে সবকিছু দান করতঃ রক্তজবার মনোময় পুষ্পমাল্য উভয় হস্তে মায়ের কণ্ঠে দিতে গিয়া শিরোপরি মুকুটে ঠেকিয়া বার বার ফেরত আসিতেছিল। এইরূপে কয়েকবার ব্যর্থ হইয়া রাজা কাঁদিয়া বলিলেন—"মা। আমি কি করিব?" বাহির হইতে উত্তর হইল—"রামকৃষ্ণ! কাঁদ কেন? মুক্তকেশীর মস্তকে আজ মুকুট দিয়া বিঘ্ন ঘটাইয়াছ।"

রাজা মন্দিরের কবাট খুলিয়া বিস্ময়ে হতবাক্। সম্মুখে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী রাজার জন্মান্তরের শ্মশান-সাধনার বন্ধু সিদ্ধসাধক পূর্ণানন্দ গিরি মহারাজ। সন্ন্যাসীপ্রবর হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, একবার ভাবিয়া দেখ, কোথায় কঙ্কণচিন্তা আর কোথায় মালা-সঙ্কট। মা তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়া আমি জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি রক্ষার মানসে আবার আসিয়াছি।" এই ঘটনার পরেই রাজা রামকৃষ্ণ রাণী কাত্যায়নীর সহিত ভৈরব-ভৈরবীর যুগল-মূর্ত্তিতে আত্রেয়ী তীরে মহাশ্মশানে পূর্ণানন্দ গিরির সহচারী হইয়া গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইলেন।

মানস পূজায় ইষ্ট দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকবৃন্দ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে মানস পূজা কত কঠিন।

ভৈরবী চক্র

ভৈরবী চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—আনন্দ ভৈরবী। তন্ত্রসাধকগণ নিজ নিজ শক্তিসহ চক্রাকারে বসিয়া পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা করেন। ইহাদের মধ্যে যিনি প্রবীণ কুলাচারী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি এই অনুষ্ঠানের চক্রেশ্বর পদবী প্রাপ্ত হন এবং ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। এই চক্রের পুরুষসাধককে 'ভৈরব' এবং তদীয় শক্তিকে 'ভৈরবী' বলা হয়। এই সাধন পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনপথের বিঘ্নগুলির (ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি) অপসারণ বা ইহাদিগকে

বশীভূত করা। কামভোগের প্রকৃতিগুলিকে নিজের বশে আনা ইহার অন্যতম লক্ষ্য। বীরাচারী সাধকের কাছে চক্রানুষ্ঠান ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক। একজন বৈষ্ণবপন্থী সাধক মহাশ্মশানে অনুষ্ঠিত ভৈরবী চক্রের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 'নগ্ন চক্রেশ্বরের বাম উরুর উপর উপবিষ্টা নগ্নভৈরবী' দূর হইতে দেখিয়া হর-গৌরীর মূর্ত্তি তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

এই ক্রিয়ার রহস্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা পদস্খলন এড়ান প্রায় অসম্ভব। বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুহ্য বলিয়া বিশদ আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

শব সাধনা

শব সাধনায় সদ্য মৃত চণ্ডালের দেহ প্রশস্ত। অপঘাতে মৃত্যু হইলে আরও ভাল। সাধনার স্থান হিসাবে শ্মশানভূমি সেরা। বীরাচারী সাধক শবের উপর অশ্বারোহীর ভঙ্গিতে বসিয়া গুরুর উপদেশমত জপাদি ক্রিয়ায় ব্রতী হন। সাধনার প্রস্তুতি হিসাবে গুরুর নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধক সংগ্রহ করিয়া সাধনার সময় নিজের কাছে রাখেন। শাস্ত্রানুযায়ী তিথি, বার, নক্ষত্র ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তারিখ সাব্যস্ত করিতে হয়। মহানিশায় এই ক্রিয়া চলে। গুরুই সাধারণতঃ অদূরে অবস্থান করিয়া উত্তর-সাধকের কাজ করিয়া থাকেন। ক্রিয়া চলাকালে অবস্থাভেদে শবের মুখের মধ্যে পূর্ব্ব-সংগৃহীত খাদ্য দিতে হয়। ঐ সময় সাধক ঝড়-ঝাপটা, বজ্রবিদ্যুৎ ইত্যাদি অনেক কিছু অনুভব করেন। গুরু শিষ্যকে রক্ষা করার জন্য সাধন স্থানের চতুর্দ্দিকে মন্ত্র দ্বারা বেষ্টনী করিয়া দেন যাহাতে শিষ্যের কোন অমঙ্গল না ঘটে। নানাপ্রকার মূর্ত্তি সাধকের সামনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাভাবে প্রলোভিত করে। গুরু-উপদিষ্ট সাধক ঐসবে প্রলোভিত না হইয়া আপন ক্রিয়ায় মগ্ন থাকেন। অনেক সময় অপদেবতারা ভীতি উৎপাদন

করিয়া থাকেন। ইহাতে কোন কোন সাধকের আসন শিথিল হয় এবং পলায়নের ইচ্ছা জাগে। তখন উত্তরসাধক (সমর্থ গুরু) দূর হইতে অনুভব করিয়া মা ভৈঃ রবে সাধকের প্রাণে সাহস সঞ্চার করেন। যার ফলে সাধক দ্বিগুণ উৎসাহে আপন ক্রিয়ায় অগ্রসর হন। এই সাধনার ফলে ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ, এমনকি তাহার সহিত কথোপকথন, সম্ভব হয়। একরাত্রে কয়েক ঘণ্টার সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা প্রচলিত অসংখ্য প্রকার সাধনপন্থার সহিত তুলনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া উপায় নাই। এক কথায় এই সাধন পদ্ধতি অতুলনীয়।

পরাজ্ঞানই পরাশক্তি

তন্ত্রমতে আদ্যাশক্তি দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। একভাগ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-প্রকৃতি এবং অপরভাগ মায়া-প্রকৃতি। আবার মায়া যখন তাঁহার শক্তি তখন তিনিই সেই শক্তিমতী ঈশ্বরী। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ অংশকে 'আত্মা' বলা হয়। দেহের সমস্ত পদার্থই অচেতন, আত্মাই একমাত্র চৈতন্যময়। সূর্য্যকিরণ যেমন সব আলোকের নিদান, তদ্রূপ একমাত্র আত্মাই দৈহিক চেতনার হেতু। সূর্য্য যেমন তদীয় কিরণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন, আত্মাও তদ্রূপ চেতনা হইতে ভিন্ন বস্তু নহেন। ইহার নাম চিৎশক্তি। চৈতন্য বা চেতনা বলিয়া আমরা যাহা অনুভব করি, তাহারই নাম শক্তি। যাহার দ্বারা সমর্থ হওয়া যায় অর্থাৎ যাহার প্রেরণায় আমাদের দেহস্থিত ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সচেতনের ন্যায় কাজ করে, তাহারই নাম শক্তি। আবার এই শক্তি বিশ্বব্যাপিনী বলিয়া ইহার নামান্তর 'আত্মা'। 'অততি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা'। এই শক্তিরূপ আত্মাই ব্রহ্ম।

স্থূল দৃষ্টিতে 'আত্মা', 'শক্তি' এবং 'চৈতন্য'—এই তিনটি শব্দ লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি। 'আত্মন' শব্দ পুংলিঙ্গ, 'শক্তি' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'চৈতন্য' শব্দ ক্লীব লিঙ্গ। নির্গুণ চিৎশক্তিতে কোন প্রকার ভেদ নাই বলিয়া চৈতন্য বা ব্রহ্মকে শাস্ত্র ক্লীবরূপ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবার ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির প্রকারভেদে জগৎপিতা এবং জগজ্জননী হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব অনুসারে সকল দেবকে পুরুষরূপ এবং সকল দেবীকে স্ত্রীরূপ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা শুধু কল্পনা নহে, বাস্তব সত্যের রূপদান মাত্র। উভয়ের সংযোগে মায়িক সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার বর্ণনায় স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্ব; মায়াতীত অবস্থায় ক্লীবত্ব। ক্লীব বলিলেও তাঁহার মধ্যে স্ত্রীশক্তি এবং পুরুষশক্তি অব্যক্তভাবে বিদ্যমান—ইহাই বুঝিতে হইবে। কোন ক্লীবের শরীরে পুরুষদেহের সৌসাদৃশ্য এবং কোন ক্লীবের শরীরে স্ত্রীদেহের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নপুংসকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ঋতু-রক্তের ভাগ অতিরিক্ত হইলে নারী, শুক্রের ভাগ অতিরিক্ত হইলে পুরুষ এবং শুক্র ও শোণিতের ভাগ সমপরিমাণ হইলে নপুংসক জাত হয়। সমপরিমাণ দ্বারা স্ত্রীর দেহে দ্বাবিংশতি (২২) মাত্রা রজঃ এবং পুরুষের দেহে চতুর্দ্দশ (১৪) মাত্রা শুক্র উৎপন্ন বোঝায়। পূর্ব্বে বর্ণিত ক্লীবের মধ্যে যদ্রূপ স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত থাকার ফলে তাহারই স্থূল প্রকাশ স্ত্রীমূর্ত্তি ও পুরুষমূর্ত্তি, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যেও শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব অব্যক্তরূপে অন্তর্নিহিত এবং তাহারই ব্যক্তভাব উমা-মহেশ্বর, সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি যুগ্মপ্রকাশ। এতদ্ভিন্ন শিব-শক্তির ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত অভিন্ন আনন্দঘন ব্রহ্মমূর্ত্তিই ব্রহ্মাদির আরাধ্যা আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যা। আশাকরি এখন কাহারো বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে 'চৈতন্য' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলেও 'চৈতন্য' শক্তি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহেন। 'ক্তি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয় বলিয়া 'শক্তি' বলিতে কেবল স্ত্রীমূর্ত্তি বুঝাইবে—ইহা একটি ভুল ধারণা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। সৃষ্টি-কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত শক্তির পুরুষমূর্ত্তিতে প্রকাশ লীলা-বিলাস মাত্র।

ক্লীবদেহ যদ্রূপ প্রজনন শক্তি বর্জ্জিত, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মও তদ্রূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ক্রিয়া বর্জ্জিত। সগুণ অবস্থায় গুণবিভাগ

অনুসারে সেই সেই গুণের নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গৌরী প্রভৃতি স্বরূপের প্রকাশ এবং ইহারা পুরুষ হউন বা স্ত্রী হউন, সমস্তই শক্তিরূপ ছাড়া অন্য কিছু নহেন। সাধক যে কোন শক্তির উপাসক হউন না কেন, যতদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য শক্তি তাহার উপাস্য শক্তি হইতে অভিন্ন বোধ না হইতেছে, ততদিন মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। আমার উপাস্য দেবতাই জগতের উপাস্য দেবতা। কারণ আমার উপাস্য যিনি, অন্যান্য সকল মূর্ত্তি তাঁহারই লীলা-বিভূতি। নিজ নিজ উপাস্য শক্তির অপূর্ণ জ্ঞান নিয়া মুক্তির স্বাদ লাভ করা যায় না। ইহা খুবই কঠিন ব্যাপার। ভগবতী নিজ পিতা হিমালয়কে বলিয়াছেন—"সহস্র সহস্র পুরুষের একজন যদি সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, যাহারা এইরূপ যত্ন করে, তাহাদেরও সহস্র সহস্রের মধ্যে কেহ আমায় স্বরূপতঃ জানে।" কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনুরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—"**অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।**" অনেক জন্মের পর সিদ্ধ হইয়া, তবে জীব পরমা গতি লাভ করে। পুনরায় বলিয়াছেন—"**বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।**" বহু জন্মের পর জ্ঞানবান হইয়া তবে জীব আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
বহূনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে ॥
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে ॥"

"দেবি! শিবশক্তিময় স্বরূপতত্ত্বই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। বহুজন্মের সাধনার পরে জীবের এই শক্তিজ্ঞানের উদয় হয়। শক্তিজ্ঞান না হইলে নির্ব্বাণমুক্তি হয় না।"

"তন্ত্রে ভগবান আত্মনির্দ্দেশে বলিয়াছেন—

"শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরমার্থতঃ।"

শক্তি, মহেশ্বর এবং ব্রহ্মা—এই তিন শব্দই তুল্য অর্থের বাচক। স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক বলিয়া যাহা কিছু ভেদ, তাহা কেবল শব্দগত, পরমার্থতঃ বস্তুগত কোন ভেদ নাই।"

শক্তি-তত্ত্বানুযায়ী কালী, তারা, দুর্গামূর্ত্তিকেই একমাত্র 'শক্তি' শব্দের প্রতিপাদ্য বুঝিলে শক্তিতত্ত্ব যেমন খণ্ডিত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুকে শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ভাবিলে বিষ্ণুতত্ত্বও খণ্ডিত হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কি স্ত্রীবাচক, কি পুরুষবাচক, কি নপুংসকবাচক সর্ব্বস্তরেই 'শক্তি' ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে নিহিত—এই ভাবের পূর্ণ উপলব্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও তন্ত্র

গীতার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তন্ত্রের মধ্যে তার সাধনার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতার চতুর্থ অধ্যায় হইতে দুইটি শ্লোক পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থিত করিতেছি।

(১) **শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।**
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

পদ্যানুবাদ—

"শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় তৎপর যে হয়,
সে জ্ঞান অর্জন সেই করে সুনিশ্চয়,
জ্ঞান লভি জিতেন্দ্রিয় তৎপর সেজন,
অচিরে পরমা শান্তি করেই বরণ।"

(২) **অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।**
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

পদ্যানুবাদ—

"বিনাশ প্রলব্ধ হয় সেই সুনিশ্চয়,
শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মা অজ্ঞ যেই হয়;
সংশয় জড়িত আত্মা রহিয়াছে যার,
ইহকাল, পরকাল, সুখ নাহি তার।"

সেই শ্রদ্ধা, সেই প্রচেষ্টা, সেই ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করা তখনি সম্ভব, যখন আমরা নিজ নিজ শক্তির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি। শক্তিকে আপন চেষ্টা দ্বারা চিনিয়া তাহাকে জাগাইতে হইবে অর্থাৎ তাহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে। যার ফলে সাধক সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশান্তির অধিকারী হইতে পারেন। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে অর্থাৎ সংশয়ের মধ্যে ডুবিয়া রহিলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—সকলকে এই মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করা। তন্ত্রসাধকগণ বস্তুবিচারের দ্বারা স্বীয় অন্তরস্থ শক্তির সন্ধান লাভ করার পর আত্মচেতনাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাগরিত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

এই সব কারণে কেহ কেহ তন্ত্রকে Practical বেদান্ত বলিয়া থাকেন।

পশুবলি

তন্ত্রমতে শাস্ত্রানুযায়ী দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বলি প্রদান করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। রসনার তৃপ্তির জন্য বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণী হিংসা তন্ত্র কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণী হিংসাকারীকে তৎপশুর রোম-সমসংখ্যক যুগ পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হইবে। কর্ত্তা, অনুমোদক, ঘাতক, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাকাদি-কর্ত্তা ও ভোক্তা—এই সব ব্যক্তিরা সকলেই বধজনিত প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। বিশেষতঃ ক্রেতা, বিক্রেতা এবং ঘাতক—এই তিনকে ঘাতক পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

তন্ত্রে আরও আছে যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অহিংসাজনিত সুখের ন্যায় সুখ আর নাই। শাস্ত্রানুসারে পশুবলি দ্বারা যে হিংসা করা হয়, তাহাই অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণী হিংসা মাত্রই শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ পশু-হিংসা। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে শাস্ত্রবিহিত বলিদান ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার প্রাণীহিংসা

ত্যাগ করার উপদেশ তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সর্ব্বপ্রকার পশু-হিংসা যদি বর্জ্জনীয় হয়, তবে বিধিমত বলিদান কি প্রকারে সমর্থন করা যাইতে পারে? তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার মীমাংসা আছে। যে বিষ মানুষের প্রাণ নাশ করে, উপযুক্ত চিকিৎসক সেই বিষ দ্বারাই মানুষের নষ্টপ্রায় প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ বিধি লঙ্ঘনকরতঃ কৃত হিংসা পাপোৎপাদন করে এবং বিধিমত হিংসা অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান পাপ বিনাশ পূর্ব্বক স্বর্গসাধিকা হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে (১১।৫।১৩) দেবতার উদ্দেশে পশু হনন হিংসার সামিল নহে।

তন্ত্রোক্ত পূজা-পদ্ধতি

যুগের পরিবর্ত্তনে মন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। তারকব্রহ্ম নামের যুগে যুগে কিভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, অন্যত্র তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। যে সকল মন্ত্র সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে ফলপ্রসূ ছিল, কলিযুগে, বিশেষতঃ কলি প্রবল হওয়ার পর—সেই সব মন্ত্র হইতে কোনও ফল পাওয়া যাইবে না বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে বহুপূর্ব্বে জনগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শাস্ত্রানুযায়ী কলি যেদিন প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতে পাঁচ হাজার বৎসর কলির প্রারম্ভকাল। তৎপর কলি প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই হিসাবে অর্থাৎ কলিপ্রবল হইতে আরম্ভ হওয়ার পর আরও একশত বৎসরের কাছাকাছি সময় অতীত হইয়াছে। কলি প্রবল হইলে পর যে সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তাহা 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের' চতুর্থ উল্লাসে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সদাশিবের অভিপ্রায় এই যে কলি প্রবল হওয়ার পর একমাত্র তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে দশবিধ সংস্কার সহ নিত্য নৈমিত্তিক পূজা কর্ম্মাদি সমাপন করিতে হইবে। তদন্যথায় ক্রিয়াদি হইতে ফল পাওয়া যাইবে না। উপরন্তু ক্রিয়াকর্ত্তা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।

আজকাল পূজা করিয়া ফল না পাওয়ার একটি মুখ্যকারণ তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে পূজা না করা। পাঠকবৃন্দের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁহারা তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি পুস্তকখানি সামান্য আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে সমস্ত ক্রিয়া বীজমন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তান্ত্রিক বীজের অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে সকলেই অবহিত। সুতরাং তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, উহা যে আশুফলপ্রদ হইবে, সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। তন্ত্রোক্ত দশকর্ম্ম ও পূজাপদ্ধতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে সর্ব্ব সম্প্রদায় তথা আপামর জনসাধারণের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণীয়। তন্ত্রের সার্ব্বভৌম দৃষ্টির ইহা অন্যতম প্রমাণ।

শিব-শক্তি

শিব ও শক্তি নিয়া তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। শৈবাগম মতে শিব প্রধান, আবার শাক্তাগমের সিদ্ধান্তে শক্তির প্রাধান্য।

বই পড়িয়া সাধনা হয় না। মাটিতে সাঁতার শিখিয়া জলে নামিলে কোন ফল হয় না। জলে নামিয়াই সাঁতার শিখিতে হয়। সাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়ামূলক। উপদেশ কার্য্যকরী নয়—একথা আমাদের প্রতিপাদ্য নহে। তবে অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বস্তরে গুরুমুখ হইতে লাভ করার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে আছে। কারণ গুরু দ্রষ্টা এবং মন্ত্র চৈতন্যময়।

বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক, একদা শক্তিতত্ত্বে ঘোর অবিশ্বাসী, শিবাবতার, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একশত তিন (১০৩) শ্লোকে জগন্মাতার রূপগুণমহিমাত্মক যে স্তব রচনা করিয়াছিলেন তাহার আদি শ্লোক এইরূপ ঃ—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভাবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহর-বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥"

বাংলা অনুবাদ/মর্ম্মার্থ।

"মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তিনি নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্যথা অর্থাৎ শক্তি বিরহিত হইলে প্রভুত্ব দূরে থাক, আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে নিজ নয়ন-স্পন্দনেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে, তন্ত্রমতে 'শক্তি' শব্দের ইকার—শিব যতক্ষণ শক্তিযুক্ত—ইকার বিশিষ্ট ততক্ষণই শিব, শক্তিবিরহিত (ইকারহীন) হইলেই শিব আর তখন শিব নাই, নিস্পন্দ শব। অতএব তুমি জগদারাধ্য হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও আরাধ্যা আদ্যাশক্তি, মা! তোমার যে ত্রৈলোক্যদুর্লভ চরণাম্বুজে ব্রহ্মাদির মস্তক লুণ্ঠিত হয় সেই চরণে মস্তক প্রণত করিতে বা স্তব করিতে অকৃতপুণ্য আমি কিরূপে সমর্থ হইব? অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যে শক্তি-তত্ত্বের আংশিক মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তোমার সেই স্ব-স্বরূপ শক্তি-তত্ত্ব তুমি স্বয়ং প্রকাশ করিয়া না দিলে কাহার সাধ্য তাহা অবগত হইতে পারে? জন্মজন্মান্তরের সাধন-জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত না থাকিলে সে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয় না। তাই জীব তোমার ক্রোড়ে থাকিয়াও তোমায় চিনিতে পারে না। মা! আমার আজ সেই দশা। কৃত অপরাধ-ভয়ে তোমার স্তব করিতে, তোমাকে প্রণাম করিতে কিছুতেই আর সাহস হয় না।"

পাঠকবৃন্দ! পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম সম্যক্ অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝা যায় যে পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়ার স্ব-স্বরূপ শক্তিতত্ত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আংশিক মাত্র অবগত হইয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবার অন্য স্থানে বলিয়াছেন—**"তথা মে সৌন্দর্য্য—পরমশিব দৃঙ্মাত্র বিষয়ঃ।"** তোমার যে সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের দর্শনমাত্র—গোচর, জীবের তাহা দর্শন করিতে অধিকার কোথায়? মায়াবাদী বৈদান্তিকেরা দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া মহামায়ার (মহতী মায়া যস্যা সা মহামায়া) সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব কিভাবে উপলব্ধি করিবেন? মহামায়ার

মহাশক্তিতে আবদ্ধ জীব একমাত্র তাঁহার অহেতুক কৃপায় সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে ধন্য হইতে পারেন। যেমন কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে মহামায়া প্রথমে বালিকাবেশে এবং পরে মহাজ্যোতিঃ রূপে শঙ্করাচার্য্যকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আদ্যন্ত স্তব-লহরীর পুনর্মুদ্রণ এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে ও অন্নপূর্ণামায়ের মন্দিরে যে অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বিরত রহিলাম।

মায়ের অহেতুক কৃপালাভে মায়াবাদপ্রবর্ত্তক বেদান্ত দর্শনের প্রচারকর্ত্তা দার্শনিক চূড়ামণি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জগজ্জননী অন্নপূর্ণামায়ের মন্দিরে মহাশক্তির গুণমাহাত্ম্যপূর্ণ স্তবলহরী সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন, যাহার মাত্র আদি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই স্তবলহরীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক শক্তি-তত্ত্ব, শক্তি-সাধনা এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর বর্ণনা পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখে। ইহা মায়ের দর্শনদানের প্রত্যক্ষ পরিণতি নয় কি?

শক্তিতত্ত্বের আলোচনা পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে একমাত্র মাতৃসাধকই অন্তিমে মোক্ষ লাভের অধিকারী। বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। করুণাময়ী মা সকল উপাসককে অধিকারী ভেদে ভব-বন্ধনমুক্ত করেন। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণের উদ্ধার। অপরদিকে স্বয়ং মহাদেব মুক্তকেশীর চরণতলে শবরূপে অবস্থিত থাকিয়া জীবকুলকে দেখাইলেন যে মুমুক্ষু জীব মায়ের চরণতলে হৃদয় ঢালিয়া আপন অস্তিত্বকে বিলাইয়া দিলে মুক্তিদাত্রীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইবে না।

সন্তান-বৎসলা জননীর কি অপূর্ব্ব কারুণ্যলীলা!

তন্ত্র ও দর্শন

তন্ত্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক। ইহার লক্ষ্য জাগতিক বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সূক্ষ্ম উপাদান পর্য্যন্ত সবকিছুর পরীক্ষা দ্বারা ভালমন্দ বিচার-ক্রমে মূল তত্ত্বের আবিষ্কার। তন্ত্রবিদের মন সব সময় বিশ্লেষণাত্মক (Analytic)। অন্যদিকে, দার্শনিক সবকিছুকে অখণ্ড বা সামগ্রিকভাবে দেখিয়া স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিভোর। দার্শনিকের চিন্তাধারাকে বলা যায় সংশ্লেষণাত্মক (Synthetic)।

তন্ত্র সৃষ্টির কোন বস্তুকে বর্জ্জন করে না বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না। এই প্রসঙ্গে পরমাণু শক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক রূপের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ এই বিষয়ে পৃথিবীর জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ অবহিত এবং সচেতন। অপরপক্ষে, এই শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা জগতের বহুপ্রকার কল্যাণ সাধন সম্ভব। বহুদেশে পরমাণু বিজ্ঞানীরা গভীর গবেষণায় নিযুক্ত। ইতিমধ্যে অনেক দেশ এই শক্তিকে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করিয়া বহুজনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি ইহার কল্যাণ-মূলক ব্যবহারের পরিধি বহু বিস্তৃতি লাভ করিবে। উপযুক্ত অধিকারীর কাছে প্রয়োগ ব্যবস্থার ভারার্পণ করিলে ভয় বা আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। এই মন্তব্য সুপরিকল্পিত International Control Agency-র ইঙ্গিতবাহক মাত্র।

মল, মূত্র ইত্যাদি বাহ্য দৃষ্টিতে ঘৃণ্য হইলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সমধিক। কারণ মল, মূত্র, থুথু ইত্যাদির পরীক্ষা দ্বারা আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র রোগ নির্ণয় সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। যোনি ও লিঙ্গ নিয়া আলোচনায় অশ্লীলতার ছাপ

থাকার অভিযোগে কোন কোন মহল হইতে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। কিন্তু তন্ত্রবিদের কাছে যোনি ও লিঙ্গ নিয়া আলোচনা অতীব প্রয়োজন বলিয়া অপরিহার্য্য; কারণ উহা সৃষ্টিরহস্য-ভেদ এবং ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক।

এই সব কারণে তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বের কোন বস্তুকে বর্জ্জন বা উপেক্ষা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য অধিকারীর প্রশ্ন উঠে। তন্ত্র নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব রূপদান করিয়াছে। অবশ্য মূল লক্ষ্য সব সময় সেই পূর্ণ সত্তার উপলব্ধি লাভ করা। আবার দার্শনিক আলোচনার একই লক্ষ্য অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি। একে অন্যের সহায়ক বলিলে অন্যায় হইবে বলিয়া মনে করি না।

ওঁ কার (প্রণব)

ওঁ কারের অপর নাম প্রণব। অ, উ, ম এবং চন্দ্রকলা—প্রকৃতি নিয়া ওঁ কার নিষ্পন্ন হইয়াছে। অকারে ব্রহ্মা, উ কারে বিষ্ণু এবং মকারে মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে বোঝায়। আবার অ কার দ্বারা নাদরূপ, উকার দ্বারা বিন্দুরূপ, মকার দ্বারা কলারূপ এবং ইহাদের সমষ্টি ওঁ দ্বারা জ্যোতিঃরূপ বোঝায়। ইহার মধ্যে তিন শক্তি—ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এবং তিনগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নিহিত। এইজন্য ইহাকে "ত্রয়ী" বলা হয়। উপনিষদে আছে—"**ত্রিপাদস্যামৃতং দিবিঃ।**" আবার কুণ্ডলিনী শক্তির ত্রিপাদ—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা —স্বর্গলোকে অর্থাৎ রহস্যলোক হৃদয়ের মধ্যে স্থিত এবং একপাদ (বৈখরী বাক্) ভূলোকে প্রকাশিত।

শাস্ত্রে আছে—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণোভবেৎ॥"

ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ—প্রণবের সাতটি অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান এবং পঞ্চ দেবতা সম্বন্ধে সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে জ্ঞানার্জ্জন বা সম্যক্ অবহিত হওয়া। ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইরূপ—

(১) **সপ্ত অঙ্গ ঃ**—অ, উ, ম, নাদ (⌣), বিন্দু (.), কলা (–) এবং কলাতীত (=)।

(২) **চতুষ্পাদ ঃ**—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী।

(৩) **ত্রিস্থান ঃ**—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা।

(৪) **পঞ্চদেবতা ঃ**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গের চিহ্ন সূর্য্যকিরণের সপ্তবর্ণে পাই। এই সপ্তবর্ণের মধ্যে নীল, পীত এবং লোহিত বর্ণ মুখ্য ; অপর চারিটি যৌগিক। নীলবর্ণ তমোগুণের, পীতবর্ণ সত্ত্বগুণের এবং লোহিত বর্ণ রজোগুণের দ্যোতক।

সামাজিক ব্রাহ্মণদের কাছে আবেদন তাঁহারা যেন ব্রহ্মতত্ত্ব অবহিত হইয়া ব্রহ্মসূত্রের মর্যাদা রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।

কামিনী-কাঞ্চন

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ সম্ভব নহে। কারণ সংসারী লোকের পক্ষে অর্থ এবং পরমার্থ দুইটাই চাই। তন্ত্রসাধনা মুখ্যতঃ গৃহীর সাধনা। আসক্তিশূন্য হইলে এই দুইয়ের মধ্যে থাকিয়াও সাধনায় অগ্রসর হইতে অসুবিধার কোন কারণ নাই।

ইচ্ছা হইতে আসক্তি, চঞ্চল মন হইতে ইচ্ছা এবং চঞ্চল প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি। স্থির প্রাণে ঢেউ না থাকায় মন, ইচ্ছা এবং আসক্তি কিছুই থাকে না। সুতরাং কামিনী-কাঞ্চন কোন অবস্থায় অন্তরায় হইতে পারে না।

পুরুষের আত্মোন্নতির কাজে নারী বাধাস্বরূপ গণ্য হইলে, নারীর আত্মোন্নতির কাজে পুরুষ বাধাস্বরূপ হইতে বাধ্য। তন্ত্রশাস্ত্র মতে পুরুষ ও নারী একে অন্যের পূরক। ঈশ্বরের সৃষ্টি বজায় রাখিতে

হইলে উভয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সদ্‌গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিলে ভয়ের কোন কারণ নাই। তখন সংসার-আশ্রম সুখ, শান্তির নীড়ে রূপান্তরিত হইবে।

মনে প্রচণ্ড বৈরাগ্যের উদয় না হইলে, সংসার ত্যাগ একপ্রকার দুর্ব্বলতা নহে কি? ভবিষ্যতে সাধক-গবেষক এই প্রশ্নের যথাবিহিত উত্তরদানে জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল নিবারণ করিবেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব

মহর্ষি ব্যাসদেবের সপ্তদশ (১৭) পুরাণ রচনার পরও মনের তৃপ্তি সাধন হইল না। তখন মনে চিন্তা জাগিল যে তিনি ভগবতীর পরম তত্ত্ব বর্ণনা করেন নাই। এইরূপ ভাবিয়া তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া শ্রীদুর্গার কৃপালাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। দেবী তপস্যায় পরিতুষ্টা হইলে আকাশবাণী হইল—"তুমি ব্রহ্মলোকে গমন কর; তথায় মূর্ত্তিমতী শ্রুতিগণের সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে এবং তাহাদের সহায়তায় আমি তোমার প্রত্যক্ষদর্শনের বিষয়ীভূতা হইব।"

সেই অনুসারে ব্যাসদেব ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া মূর্ত্তিমন্ত বেদচতুষ্টয়কে দেখিতে পাইয়া প্রণামান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—"অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব কি?"

বেদচতুষ্টয় উত্তরে একে একে বলিতে লাগিলেন।

(১) ঋগ্বেদ বলিলেন—"সমস্ত ভূত যাঁহার ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরের অন্তর্গত, যাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত, ত্রিজগৎ যাঁহাকে পরম তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই দেবী ভগবতী স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।"

(২) যজুর্ব্বেদ বলিলেন—"যে ঈশ্বরী নিখিল যজ্ঞের দ্বারা এবং যোগের দ্বারা আরাধিতা হইয়া থাকেন, যাঁহার প্রভাবে আমরা (বেদগণ) প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, সেই একমাত্র ভগবতীই স্বয়ং ব্রহ্ম।"

(৩) সামবেদ বলিলেন—"যৎ কর্ত্তৃক এই নিখিল বিশ্ব ভ্রামিত হইতেছে, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন, যৎ কর্ত্তৃক এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই একমাত্র জগন্ময়ী দুর্গা পরমব্রহ্ম।"

(৪) অথর্ব্ববেদ বলিলেন—"ভক্তিহেতু অনুগৃহীত জনগণ যে সুরেশ্বরীকে দর্শন করিয়া থাকেন, সর্ব্বশাস্ত্রে সেই দুর্গাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।"

তৎপর শ্রুতিগণের সহায়তায় জগদম্বার প্রত্যক্ষ-দর্শন এবং তাঁহার নানা বিভূতি ও লীলাবৈচিত্র্য দৃষ্টে ব্যাসদেবের সংশয়োচ্ছেদ ঘটে। যার ফলে তিনি নিশ্চিতজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। অতঃপর আশ্রমে ফিরিয়া 'দেবী ভাগবত' রচনা করেন।

এই দেবী ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে—একসময় দেবর্ষি নারদ ভক্তিপূর্ব্বক মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের তিনজনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) আরাধনা করিয়া জীব, এমন কি দিক্‌পালগণ পর্য্যন্ত, কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন। আপনাদিগেরও যিনি আরাধ্যা, সেই পরিপূর্ণ অব্যয় দেবতা কে?" উত্তরদানে মহেশ্বর বলিলেন—"যিনি শুদ্ধা সনাতনী মূল প্রকৃতি, তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। যেমন এই এক ব্রহ্মা, এই এক জনার্দ্দন, এই এক মহেশ্বর আমি, আমারাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা ব্রহ্মাণ্ডবাসী এইরূপ কোটি কোটি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের একমাত্র বিধাত্রী সেই মহেশ্বরী।"

এই বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা দেবী ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মূল সংস্কৃত শ্লোক বাদ দিয়া অনুবাদমাত্র পাঠকবৃন্দের কাছে উপস্থিত করিলাম। আশা করি পাঠকবৃন্দের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হইবে না। যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ চান, তাঁহারা "দেবী ভাগবত" গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

দীক্ষা

দীক্ষার উদ্দেশ্য—

"দীয়তে জ্ঞানমত্যর্থঃ ক্ষীয়তে পাশবন্ধনম্।
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥"

আবার আছে—

"দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়স্ততঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্ত সর্ব্ব তন্ত্রস্য সম্মতা ॥"

ভাবার্থ এই যে দীক্ষা দ্বারা পাপক্ষয় এবং পাশবন্ধন দূর হয়। তারপর দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়া পাপক্ষয় করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করে, তাহাই দীক্ষা। বর্ণগুলি অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত শব্দব্রহ্ম হইতে আগত। তন্ত্রশাস্ত্রে এই বর্ণগুলিকে মাতৃকাশক্তি বলা হয়। আবার এক বা একাধিক বর্ণের সংযোজনায় মন্ত্র বা বীজ সৃষ্টি হয়। মন্ত্র এবং ইহার অভীষ্ট দেবতায় কোন ভেদ নাই, অর্থাৎ নাম ও নামী এক এবং অভেদ। ইহার প্রকৃত উপলব্ধি দীক্ষিত ব্যক্তির লক্ষ্য। এই ভাবে যে নাম বা মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাই দীক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে।

দীক্ষা আত্মসংস্কারের নামান্তর। সংসারী আত্মা পাশ দ্বারা আবৃত বা আচ্ছন্ন। দীক্ষার দ্বারা মলিন বা আবৃত আত্মার সংস্কারের কাজ হইয়া থাকে। যে ক্রিয়ার সাহায্যে জ্ঞান প্রদত্ত হয় এবং পশুভাব দূরীভূত হইয়া যায়, তাহাই দীক্ষা নামে প্রকীর্ত্তিত। গুরুর সঞ্চারিণী শক্তি এবং শিষ্যের সংগ্রাহিকা শক্তি দীক্ষার সময় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। সিদ্ধপুরুষের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শিষ্যের পাশ বা মলকে দূর করিতে সমর্থ। সহজ কথায় এই পাশ বা মলকে মানুষের চোখের ছানির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপার সাহায্যেই জীব মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া উদ্ধার লাভ করে। সিদ্ধ মহাত্মাগণ শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে

বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষার প্রয়োগ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দীক্ষা কর্ম্মবন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কালক্রমে সমূলে বিনষ্ট করিতে সমর্থ। সঞ্চিত এবং আগামী কর্ম্ম—দুইয়েরই ক্ষয় করা সাধকের লক্ষ্য। তবে মন্ত্রের আরাধনারূপ কর্ম্মকে নষ্ট করিতে হয় না। গুরুর শক্তিপাতের পরিমাণ বা তীব্রতা অনুযায়ী দীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়; যথা সময়ী দীক্ষা, পুত্রকাদি দীক্ষা, সাধক দীক্ষা, শিব-ধর্ম্মিণী ও লোক-ধর্ম্মিণী দীক্ষা, সবীজ ও নির্বীজ দীক্ষা, বিদ্যা দীক্ষা, ক্রিয়াবতী দীক্ষা, জ্ঞানবতী দীক্ষা, শাম্ভবী দীক্ষা, শাক্তী দীক্ষা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কয়েক প্রকার দীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিলাম।

(১) **সময়ী** দীক্ষা—এই দীক্ষায় সকল পশু আত্মার সমান অধিকার আছে।

(২) **ক্রিয়াবতী** বা সাধারা দীক্ষা—ইহা বাহ্য ব্যাপার সম্পন্ন।

(৩) **জ্ঞানবতী** বা নিরাধারা বা বেধাখ্যা দীক্ষা—ইহা আন্তর ব্যাপার সম্পন্ন। স্পর্শ, দৃষ্টি, মন এবং শব্দ—ইহার যে কোন একটির দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যদ্রূপ পক্ষী, মৎস্য এবং কচ্ছপ যথাক্রমে তা দিয়া, দৃষ্টি রাখিয়া এবং চিন্তা করিয়া ডিম্বকোষ হইতে স্ব স্ব বাচ্চা বাহির করতঃ পোষণ করে, সদ্‌গুরুও তদ্রূপ শিষ্যকে স্পর্শ করিয়া, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অথবা মনে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সংসার রূপ পঙ্ক হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। গুরু শিষ্যের অধিকার বা যোগ্যতা অনুসারে দীক্ষাকালে দৃষ্টি, স্পর্শ, মন ও শব্দ—এই চারিটির মধ্যে কোনও একটিকে উপায় হিসাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও মন—এই ছয়টি পদার্থ যথাক্রমে একটি হইতে অন্যটি সূক্ষ্মতর। প্রথম দুইটি অর্থাৎ ক্ষিতি ও জল বাহ্য দীক্ষার উপকরণ এবং অন্তর দীক্ষার উপকরণ অবশিষ্ট চারিটি অর্থাৎ তেজ, বায়ু, আকাশ ও মন। তেজে দৃষ্টি, বায়ুতে স্পর্শ, আকাশে শব্দ এবং মনে ধ্যান উপজাত হইয়া চক্ষু, হস্ত, মুখ এবং অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা এই দীক্ষা সম্পন্ন হয়।

৪। **শাম্ভবী** দীক্ষায় সদ্য সদ্য তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং ইহাতে কেবল কৃপা বিতরণের ইচ্ছা জাগে। এই দীক্ষার ফলে শিবের স্বরূপ প্রকাশিত হয় এবং শিষ্যের মধ্যে শিবের আবেশ হয়।

(৫) **শাক্তী** দীক্ষায় গুরু শক্তি সঞ্চার করিয়া মন্ত্রকে মূল হিসাবে অবলম্বন করিতে শিষ্যকে আদেশ দিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিষ্যবর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **ভোগার্থী** (২) **মোক্ষার্থী**।

ভোগার্থী সাধকের ভোগ পথে বাধা দান অনুচিত। তাহার জন্য আপাততঃ ভোগের ব্যবস্থা থাকিলেও অন্তে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

শক্তি মন্ত্রের দীক্ষার সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া প্রয়োজন। তারপর যথাকালে পূর্ণাভিষেক। তদনন্তর ক্রম দীক্ষার ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

আগম শাস্ত্র

আগম শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে দিলাম।

(১) আগম শাস্ত্রের ত্রিধারা—(ক) আগম, (খ) যামল এবং (গ) তন্ত্র। বারাহী তন্ত্রে ইহাদের লক্ষণাদির বিশদ বর্ণনা আছে। তন্ত্রমতে কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। বৈদিক মন্ত্রসকল এই যুগে (বিশেষতঃ কলি প্রবল হওয়ার পর) বিষহীন সর্পের মতো নির্বীর্য। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ শীঘ্র ফলপ্রদ। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যে তন্ত্রের সাধন-প্রণালী অতি গুহ্য।

(২) তিন ক্রান্তায় ৬৪ × ৩ = ১৯২ খানা প্রামাণ্য তন্ত্র ছাড়া আরও অনেক তন্ত্র প্রচলিত আছে। ক্রান্তা বিভাগ নিয়া অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা আছে। আবার কতগুলি উপতন্ত্র আছে—

রচনা করিয়াছেন, বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ। হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধদিগের অসংখ্য তন্ত্র আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলির অধিকাংশই চীন এবং তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া চীন, জাপান এবং তিব্বতে প্রচারিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্রের নাম 'ঋগ্ যুগ' ; ইহা সংখ্যায় আড়াই হাজারের উপর। হিন্দু তন্ত্রগুলি শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ভেদে তিন প্রকার। হিন্দুশাস্ত্রের তান্ত্রিক কবচের ন্যায় বৌদ্ধদিগের অসংখ্য ধারণা সংগ্রহ আছে। জৈনদেরও কিছু তন্ত্র আছে। কাশ্মীরে শৈবতন্ত্র প্রবর্ত্তিত—যাহার ভিত্তি ত্রিক্দর্শন।

(৩) Matter যেমন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে Energy তৈরী করে, তন্ত্রেও Matter and Consciousness যুক্তভাবে এক অখণ্ড শক্তি।

(৪) তন্ত্রযোগ পাতঞ্জল যোগদর্শন হইতে পৃথক। ইদানীংকালে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়—তাহা তন্ত্র-যোগের অন্তর্গত

(৫) আগমশাস্ত্রে উপাসনার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। উপাসনা ব্যতীত অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য উপনিষদে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। খুব সম্ভব এই কারণেই অদ্বৈত বৈদান্তিক আচার্য্য শঙ্কর মহাশক্তির উপাসনা করিয়াছেন।

(৬) আমরা যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তির কথা বলি, সেইরূপ শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় আত্মার শক্তির কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে যাহা আত্মা, তাহাই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—ইহা আগম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

(৭) বেদ তিন কাণ্ডে বিভক্ত—(ক) কর্ম্ম কাণ্ড, (খ) উপাসনা-কাণ্ড এবং (গ জ্ঞান কাণ্ড। বেদে উপাসনা কাণ্ড অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তন্ত্রে অত্যন্ত বিস্তৃত। উপাসনা দ্বারাই কর্ম্ম ও জ্ঞান সংযুক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্ম কর্ম্মই উপাসনা ; আবার উপাসনা সূক্ষ্মতর হইলে

জ্ঞানের সঞ্চার হয় ; অর্থাৎ কর্ম্ম উপাসনাতে এবং উপাসনা জ্ঞানে পরিণত হয়।

(৮) বহু শাস্ত্রের রহস্যবেত্তা রাঘব ভট্টের টীকা গ্রন্থে গণিত শাস্ত্র ও রেখা-গণিত শাস্ত্রের রহস্যের পরিজ্ঞান শাক্তাগম পরিজ্ঞানের জন্য একান্ত আবশ্যক। গম্ভীর রাওয়ের পুত্র ভাস্কর রাও শাক্তাগমের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তন্ত্র যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক, ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

(৯) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ডি, লিট, মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈদিক সাধনার যাহা ভাবময় অংশ, তাহাকে বাহ্যিক ক্রিয়াত্মকরূপে প্রকাশ করাই তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।" বেদান্তের সঙ্গে তন্ত্রের কোন বিরোধ নাই। সমস্ত বেদতত্ত্বজ্ঞ, অদ্বৈত বেদান্তের পরমাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী প্রভৃতি চারিটি মঠে শ্রীবিদ্যা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ মন্ত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহা অদ্যাপি নির্ব্বিবাদে চলিতেছে।

(১০) হিন্দুধর্ম্মের দুইটি ধারা প্রায় সমান্তরালভাবে ভারতবর্ষে প্রবাহিত। একটি বৈদিক, অপরটি তান্ত্রিক। বৈদিক ধারায় যাগযজ্ঞাদিতে, এমন কি বেদাধ্যয়নে দ্বিজ ভিন্ন অন্য বর্ণের কোন অধিকার নাই, কিন্তু তান্ত্রিক ধারায় যোগ্য বিবেচিত হইলে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই অধিকারী।

(১১) তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে 'যোগ্যতা' অধিকারী নির্ব্বাচনের মাপকাঠি। নারীকেও কোন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয় নাই। সাধনায় অধিকারী ভেদে বিভিন্ন স্তর আছে। কারণ সব মানুষের সামর্থ্য, মানসিক বিকাশ এবং শারীরিক গঠন একরূপ নহে। কাজেই দেখা যায় তন্ত্রের অধিকারী-বিষয়ক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞান সম্মত। তান্ত্রিক সাধনার ইহা একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(১২) তন্ত্রসাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়ামূলক হইলেও ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য অপরিসীম। তাহা সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্ব-নিরূপণে সদ্‌গুরুর সহায়তা অত্যাবশ্যক।

(১৩) বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ। অন্যদিকে তান্ত্রিক আচার্য্যগণের ত্রিরত্ন—শিব, শক্তি এবং বিন্দু। বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের মহামায়া একবস্তু নহে। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া শব্দে স্বয়ং ব্রহ্মময়ীকে বুঝায়।

(১৪) যোগমায়া মহাযোগিনী অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে সসীমের সংযোগ-সাধিকা পরাশক্তি। তিনি পরব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন।

(১৫) সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। ইহাদের সাম্যাবস্থা অব্যক্ত প্রকৃতি, মূল প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত। এই সাম্যাবস্থা পুরুষসংজ্ঞক। পরমাশক্তিই গুণান্বিত অবস্থায় প্রকৃতি এবং গুণরহিত অবস্থায় পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

(১৬) **"জন্মকালেচ জননী, স্নেহকালেচ কন্যকা**
ভার্য্যা ভোগায় সম্পৃক্তা, অন্ত কালেচ কালিকা।"

একই কালী জগতে গর্ভধারিণীরূপে জন্ম দেন, কন্যারূপে স্নেহ গ্রহণ করেন, ভার্য্যারূপে ভোগের বিষয়ভূতা হন এবং দেহান্তের সময় কালকলন-কর্ত্রীরূপে কোলে স্থান দেন। ইহাকে শিবশক্তির নরলীলা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইহা সাধকের চিন্তাধারার একটি প্রকাশ মাত্র।

(১৭) তন্ত্রের মতে পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা (শোক), জুগুপ্সা (কুকার্য্য গোপন করিবার প্রবৃত্তি), কুল, শীল (বিধিবদ্ধ আচার আচরণ) ও জাতি—এই আটটি হইল পাশ। পাশমুক্ত দ্বন্দ্বজ্ঞান হইতে মুক্ত।

(১৮) তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্তের "তন্ত্রালোক" গ্রন্থে আছে— "যখন এই শিব-তত্ত্ব ও শক্তি-তত্ত্ব পরস্পরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখনই উভয়ের যামলরূপ আবির্ভূত হয়। এই যামলরূপই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা। যামল তত্ত্বই আনন্দ শক্তি। ইহা বিশ্বময় হইলেও

বিশ্বোত্তীর্ণ। এই কারণে যামল তত্ত্ব—'পরা পরাৎ পরং তত্ত্বম্'—শিব-তত্ত্ব এবং শক্তি-তত্ত্ব অপেক্ষা পূর্ণ তত্ত্ব।"

(১৯) তন্ত্রের পদ্ধতি যোগের পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজা অলর্ককে যোগ রহস্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ঋষি দত্তাত্রয়ের উক্তি—"**ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ।**" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয় শরীর সুস্থ রাখার ফলে। তন্ত্রও সুস্থ এবং সুগঠিত দেহের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেন।

(২০) "দশচক্রে ভগবান ভূত"—ইহা একটি প্রবাদ বাক্য হইলেও ইহার মধ্যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। আমাদের দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (Endocrine gland) আছে দশটি এবং চক্রও আছে দশটি। এই দশটি চক্র হইতে সমভাবে রস নিঃসরণ হইলে সাধক ভগবানের তুল্য শক্তিলাভ করেন। ইহা তন্ত্রের ষট্‌চক্র ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

(২১) তন্ত্রের কুণ্ডলিনী শক্তিকে বেদবর্ণিত সর্পরাজ্ঞীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। "**সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতা**"। সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়া স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। সাপও এইভাবে সাপুড়ের ঝাঁপির মধ্যে থাকে মাথা নীচু করিয়া।

(২২) মূলাধার পদ্ম হইতে নিঃসৃত রস মানুষের বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ইহা রেতঃ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মাঝে আছে শুক্রকীট যাহার আকৃতি ফণাসহ সাপের মত।

(২৩) বিন্দুর অবস্থান আছে কিন্তু আয়তন নাই। "**বিন্দতে অথ বা প্রকাশয়তে অনেন ইতি বিন্দুঃ।**" বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করিয়াছেন—'বিন্দুই শুক্রকীট। ইহার গতি Positive Energy র দিকে।'

(২৪) "**ন অদতি ইতি নাদঃ।**" কিছুই গ্রাস করে না বলিয়া ইহার নাম নাদ হইয়াছে। ইহার গতি Negative energy-র দিকে। ইহা ডিম্বকীট বা স্ত্রীবীজ। নাদকে বৃত্তের চাপ দ্বারা

প্রকাশ করা বা বোঝানো হয়। প্রথমে মনে হয় প্রকৃতি যেন পুরুষকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটে তার বিপরীত। কারণ প্রকৃতি যথাসময়ে পুরুষকে বৃহত্তররূপে প্রসব করিয়া থাকেন। তন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রকৃতিই সাকাররূপে নিরাকার ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতেছেন।

(২৫) ভৈরব ডামরে আছে—

"তন্ত্রার্থং শাস্ত্রব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞাতুম্ ইচ্ছতি যঃ পুমান্।
সহবান্ধো বিজানীয়াদুলূক ইব ভাস্করম্ ॥"

যদি শাস্ত্রবিষয়ে আয়ত্ত পাণ্ডিত্যের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্য অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে পেচক যেমন সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি অবগত আছে, সেইরূপ সে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া থাকিবে। বস্তুতপক্ষে তন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটনে চাই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাধনার মিলন এবং সর্ব্বোপরি সদ্‌গুরুর উপদেশ।

(২৬) **"অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তঽপি পশুসংকটে।**
ব্যক্তী ভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥"

যদিও তন্ত্রসাধনার পথ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তথাপি অজ্ঞানতাহেতু ইহা গুপ্ত অবস্থায় আছে। যখনি কলি প্রবল হইবে, তখনি উহা প্রকাশিত হইবে।

(২৭) মানবদেহে অব্যক্ত তৃতীয় নয়ন আছে, যোগশাস্ত্রে ইহাকে কূটস্থ বলা হয়। কূট শব্দের অর্থ নেহাই। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পী-কারিগরগণ এই নেহাইর উপর স্বর্ণ বা লৌহ পেটাই করিয়া নানাপ্রকার দ্রব্য তৈয়ার করেন, কিন্তু নেহাইটির কোন পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর হয় না, অর্থাৎ নেহাই পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। সেইরূপ কূটস্থকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত জগৎ বর্ত্তমান। যাহা তুরীয় দৃষ্টি বা জ্ঞানচক্ষু, তাহাই কূটস্থ। উহাই সব কিছুর উৎস-স্থল এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারের প্রকাশ-স্থান। দূরবীণের সাহায্যে যেমন বহুদূরের বস্তু লক্ষিত হয়, তেমনি কূটস্থ স্থিতি লাভ করিলে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা সম্ভব হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে বক-যক্ষসংবাদে আছে—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।
গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহার ভিতর নিহিত আছে। সেই গুহার মধ্যে যাহা নিহিত আছে, তাহাই শাশ্বত ব্রহ্ম। উহা মনুষ্যদেহে কূটস্থরূপে বিদ্যমান। যোগশাস্ত্রে ইহা গগনগুহা নামে প্রসিদ্ধ।

(২৮) মাতৃকা-বিজ্ঞান তান্ত্রিক মহাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। তন্ত্র শাস্ত্রের রহস্যমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে মাতৃকা-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা অপরিহার্য্য। ভাষার বর্ণকে 'মাতৃকা' বলা হয়। শব্দব্রহ্ম হইতে আগত বাক্ বা ধ্বনিকে ধরিয়া রাখার জন্য বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি। বর্ণ হইতে পদ এবং পদ হইতে বাক্য। স্ফোট-বিজ্ঞান, নাদ-বিজ্ঞান প্রভৃতি মাতৃকা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

(২৯) তন্ত্রমতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্ততঃ একটিকে গুরোপদিষ্ট হইয়া অভ্যাস-যোগ সহকারে আয়ত্ত করিতে পারিলে সিদ্ধি করতলগত হয়। ক্রিয়াগুলি এইরূপ ঃ—(ক) শব সাধনা, (খ) ষট্চক্র ভেদ এবং (গ) পঞ্চ 'ম' কার সাধনা। শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস মহারাজের তদীয় গুরু তারাপীঠের মহাসাধক বামাক্ষেপার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংলগ্ন মহাশ্মশানে এক রাত্রির শব সাধনায় মায়ের দর্শন লাভ, এমন কি মায়ের সহিত কথোপকথন সম্ভব হইয়াছিল। পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত নিবেদন—একবার ভাবিয়া দেখুন, তন্ত্রসাধনা কিপ্রকার আশু ফলপ্রদ। এই তিনটি ক্রিয়ার আলোচনা পৃথকভাবে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৩০) তন্ত্র সাধনায় স্থানে স্থানে গোপনীয়তার উপর প্রভূত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে ; আবার কৌলিক তথা সমর্থ সাধকের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। যেমন—

"গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিক কুলসাধনম্ ॥"

সত্যকে গোপন করিলে তাহা হেয় হয়, গোপনতার চেষ্টায় মিথ্যার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবি। সুতরাং, উচ্চস্তরের সমর্থ সাধকের কাছে প্রকাশ্য সাধনা কাম্য।

(৩১) "হরিভক্তি-বিলাস" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে—

"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবাঃ ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসতে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্ ॥"

উপনয়নকালে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করেন বলিয়া দ্বিজমাত্রেই শাক্ত। আবার গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে আছে 'মহাদেব স্বয়ং সাধকগণকে শক্তি উপাসনা ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন—

"শক্তি জ্ঞানং বিনা দেবী নির্ব্বাণং নৈব জায়তে।"

(৩২) সংসারাশ্রমে জীব সাধারণতঃ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে জীবকে রক্ষা করাই শাস্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং তৎকল্পে তন্ত্রে নানাপ্রকার ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রে এই দুঃখকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা ঃ—

(ক) **আধিভৌতিক**—অন্য মানুষ বা হিংস্র পশু হইতে অত্যাচারজনিত দুঃখ।

(খ) **অধিদৈবিক**—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবাত্যা, বজ্রপাত ইত্যাদি হইতে দুঃখ।

(গ) **আধ্যাত্মিক**—দারিদ্র্য, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি হইতে মনস্তাপ। এখানে আধি শব্দে মনঃপীড়া বোঝায়। মানুষের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটিলে অথবা আত্মোপলব্ধি হইলে ত্রিতাপ যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

(৩৩) ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে যতপ্রকার অধ্যাত্মবিদ্যা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ লাভ। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনায় পরম পুরুষার্থ লাভের সঙ্গে সঙ্গে

অপর তিনটি পুরুষার্থ (ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম) অনায়াসে সাধকের করতলগত হয়।

(৩৪) বেদান্তের শেষ ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন যে বেদ ও তন্ত্রে প্রভেদ এই যে বেদ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—তিন বর্ণের দ্বিজদের জন্য, আর আগম শাস্ত্র আপামর সকলের জন্য।

(৩৫) আধার তত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে 'মহাশক্তি' যে পরমতত্ত্ব, তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রলয়কালে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম-মুকুলে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে ব্রহ্মার আধার বিষ্ণু। আবার বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শায়িত। সুতরাং বিষ্ণুর আধার অনন্তদেব। মহাপ্রলয়ে জগৎ যখন একার্ণবে পরিণত, তখন জলরাশি অনন্তদেবের আধার বুঝিতে হইবে। সর্ব্বশেষে জলরাশির আধার স্থিরীকরণে সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সর্ব্বভূতের আধারস্বরূপা মহাশক্তিই পরম তত্ত্ব।

(৩৬) পুরুষ-প্রধান বৈদিক সাহিত্যে মাতৃদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন রাত্রি ও ঊষা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে মাতৃকাশক্তি 'আদিশক্তির্দেবতা' হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৩৭) সৃষ্টির সবকিছুকে নিয়া আগম শাস্ত্রে আলোচনা দৃষ্ট হয়, যেমন ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্ তত্ত্ব, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। তন্ত্রে কাহাকেও বর্জ্জন বা পাশ কাটাইবার চেষ্টা নাই। গণিত বিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানের ভূমিকার মূলে কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রহিয়াছে।

(৩৮) সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের ন্যায় দুইটি প্রত্যক্ষ সত্য রহিয়াছে, যথা ভগবান ও মৃত্যু। যাহারা প্রথমটি হইতে বঞ্চিত, তাহাদের অন্ততঃ দ্বিতীয়টিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। আগমশাস্ত্রে জীব কি প্রকারে দেহান্তে মোক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এবং সাধন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

(৩৯) সমর্থ গুরুর তত্ত্বাবধানে পঞ্চ 'ম' কারের সাধনায় দিব্যভাবের সাধক যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি 'কৌল' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তন্ত্রে কৌলের বর্ণনা এইরূপ :—

"অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥"

কৌলরা অন্তরে শক্তি-উপাসন, বাহ্যিক চালচলনে ও ব্যবহারে শৈবের ন্যায় আচরণ, জনসমাজে বা সভামধ্যে বৈষ্ণবপন্থীদের ন্যায় কীর্ত্তনাদিতে অংশ গ্রহণ এবং প্রয়োজনমত নানারূপ ও নানাবেশ ধারণপূর্ব্বক সচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

তাঁহারা প্রকৃত গুপ্ত-সাধক।

(৪০) তন্ত্র সাধকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় 'অঘোরী' নামে পরিচিত। অঘোরপন্থী সাধকেরা ঘৃণাকে জয় করার জন্য শ্মশানে দাহ করার নিমিত্ত উত্থিত শবের গলিত মস্তিষ্ক আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আরও এক সম্প্রদায় 'অবধূত' বলিয়া চিহ্নিত। 'অবধূত' শব্দের অর্থ যাহার ধূত বা পাশ নাই অর্থাৎ পাশমুক্ত। জীব পাশবদ্ধ। অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইলে শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এইজন্য অবধূতেরা অতি বরেণ্য।

(৪১) ভোগকে পাশ কাটাইলে চলিবে না। ইহাকে আস্বাদন করিতে হইবে। যদিও পথটি খুব সহজ নয়, তথাপি দিব্যজীবন লাভের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে প্রদর্শিত যোগ-সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। ফল যথাসময়ে অবশ্য লাভ হইবে। এই জন্য বলা হয়— তন্ত্র-সাধনা মুখ্যতঃ গৃহীর সাধনা।

(৪২) 'যন্ত্র' দেবতার মনোময় শরীর। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে আছে—

"শরীরং ত্রিবিধং প্রাহু ভৌতিকং চ মনোময়ম্।
পরাং জ্ঞানময়ং নিত্যং যদনাশি নিরন্তরম্ ॥
মুদ্রাং ভৌতিকমিত্যমিত্যাহুর্যন্ত্রং বিদ্ধি মনোময়ম্।
মন্ত্রং জ্ঞানময়ং বিদ্ধি এবং ত্রিধা বপুর্ভবেৎ ॥"

শরীর তিনপ্রকার—(ক) ভৌতিক (খ) মনোময় এবং (গ) পরাজ্ঞানময় (নিত্য, অবিনাশী এবং সতত বর্ত্তমান)। মুদ্রাকে ভৌতিক শরীর এবং যন্ত্রকে মনোময় শরীর বলা হয়। মন্ত্রই জ্ঞানময় দেহ। পূজাকালে যন্ত্র অঙ্কনের বিধি আছে। দেবতা ভেদে যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। যন্ত্রের উপর ঘট স্থাপনক্রমে পূজা সম্পাদিত হয়। যন্ত্র-রহস্য গুরুর নিকট হইতে সম্যক্ অবগত হওয়ার উপদেশ তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা স[illegible] বজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত। হিন্দুর পূজা পদ্ধতি যে বিজ্ঞান ভিত্তিক, যন্ত্র-রহস্য অবগত হইলে তাহা আমাদের অনুভবে আসে।

(৪৩) তন্ত্রে অষ্টবর্গের উল্লেখ আছে।

'ক' বর্গ হইতে 'প' বর্গ পর্য্যন্ত পাঁচ বর্গ। আবার প্রত্যেক বর্গের বর্ণ সংখ্যা পাঁচ।

'য' বর্গের বর্ণ সংখ্যা চার (য, র, ল, ব)।

'শ' বর্গেরও বর্ণ সংখ্যা চার (শ, ষ, স, হ)

'ল' বর্গের বর্ণ সংখ্যা দুই (ল, ক্ষ)।

(৪৪) 'সারদাতিলকের' প্রথম পটলে আছে—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকারঃ **সগুণ** এবং **নির্গুণ**। এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং মায়াতে উপহিত হইলে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। তিনি যখন কলাযুক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত, তখন তাহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়।

(৪৫) কাদিমতাখ্য তন্ত্র সম্পর্কে জানা যায় যে দেবী শঙ্করকে বলিলেন—"তুমি এমন একখানা তন্ত্র রচনা কর, যাহা এক হইলেও তাহার মধ্যে সকল পুরুষার্থ সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইবে।" দেবীর এই অনুরোধে শঙ্কর কাদিমতাখ্য স্বতন্ত্র তন্ত্র প্রকাশ করেন। অন্যান্য তন্ত্র পরস্পর সাপেক্ষ, কিন্তু এই তন্ত্রখানি অন্যনিরপেক্ষ। এই কারণে ইহা অনাদি তন্ত্র হিসাবে তান্ত্রিক সমাজে সমাদৃত।

(৪৬) বেদেও তন্ত্রের ন্যায় দেব দেবীর অভেদ কল্পনা দৃষ্ট হয়। বেদে 'দ্যাবা পৃথিবী'কে পিতা এবং মাতারূপে ভাবনা করা হইয়াছে। শিব পুরাণে আছে—'**আকাশং লিঙ্গমিত্যাহু পৃথিবীতস্য পীঠিকা**।' আকাশ লিঙ্গস্বরূপ এবং পৃথিবী যোনিরূপা।

(৪৭) তন্ত্রমতে (শারদা তিলক) বলা হইয়াছে যে বিন্দু-বিসর্গের সংযোগে শিব-শক্তির দ্বৈতরূপ প্রতিষ্ঠিত এবং উহার মিলিত অবস্থায় অর্দ্ধনারীশ্বররূপের উদ্ভব।

(৪৮) শৈবরা শিব ও শক্তির ভেদ স্বীকার করেন না। একমতে শিব শক্তিরহিত নন, শক্তিও শিবহীনা নহেন। শিবাদ্বৈতবাদীদের মতে শক্তিই শিবকে জানাবার উপায়।

(৪৯) গন্ধর্ব্ব তন্ত্রমতে 'চেতনাচেতন' জগৎ শিব-শক্তিময়।

(৫০) মহাভারতে শিব ও কালীর উল্লেখ আছে। সেখানে শিবকে 'রক্তমালাম্বরধর', 'পক্কান্ন মাংস লুব্ধ', 'দশবাহু', 'অষ্টাদশভুজ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এই সব বিশেষণ দেবী কালিকা বা দুর্গা সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। শিব ব্রহ্মচারী, দেবী ব্রহ্মচারিণী। শিব অসুরঘ্ন এবং মহিষঘ্ন, দেবীও অসুরনাশিনী এবং মহিষমর্দ্দিনী। শিব শ্মশানবাসী, দেবী শ্মশানবাসিনী। ঋগ্বেদে যজ্ঞবেদীকে যোনি বলা হইয়াছে। ততুপরি রুদ্রের নামে হোমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তান্ত্রিক হোমের পূর্ব্বে যে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান করা হয় তাহাতে '**বাগীশ্বরেন সংযুক্তং ক্রীড়াভাব সমন্বিতাম**' বলা হইয়াছে।

(৫১) মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রে বলা হইয়াছে—যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা, সেই বীজ হইতে সেই দেবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইবেন, ইহা নিশ্চিত। কারণ দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়। 'যাঁহার মনন্ হইতে বিশ্ব-বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মসত্বা এবং ব্রহ্মাণ্ডসত্বা পৃথক কিছু নহে'—এই অনুভূতি জাগে 'মন্ত্র' শব্দের 'মন' হইতে। আবার সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় উহার 'ত্র' অংশ হইতে। তারপর 'মন্' এবং 'ত্র' এর সমষ্টিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ হয়। মন্ত্রশক্তি দ্বিবিধ—(ক) **বাচ্যশক্তি**,

(খ) বাচকশক্তি। যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা, তিনি বাচ্যশক্তি; আর যিনি মন্ত্রময়ী দেবতা, তিনিই বাচক শক্তি। বাচ্যশক্তি নির্গুণ, কিন্তু বাচকশক্তি সগুণ। সাধকের উপাসনায় বাচকশক্তি জাগরিতা হন। সমস্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি মূলাধারবাসিনী কুণ্ডলিনী শক্তির অঙ্গবিভূতি ছাড়া অন্য কিছু নহে। 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ হইতে নয়কোটি মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। চন্দ্রকিরণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যদ্রূপ চকোর ভিন্ন অন্যে জানে না, তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির তত্ত্বসুধা একমাত্র দীক্ষিত সাধক-সাধিকারাই অবগত হন।

(৫২) দীক্ষাকালে দেবতার স্বরূপমন্ত্র যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে বীজমন্ত্র বলা হয়। সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই বীজ একসময়ে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে শাখাপল্লবযুক্ত বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। মন্ত্রাত্মক কবচ তাহার ফলস্বরূপ। ফলমধ্যে বীজ নিহিত এবং বীজের মধ্যে সূক্ষ্ম আকারে অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প ইত্যাদি নিহিত থাকে।

(৫৩) **"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা"**—ইহার সঠিক অর্থ বোঝা একান্ত আবশ্যক। চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্ফল, অশরীরী ব্রহ্ম সাধকগণের হিতার্থ স্বীয় রূপ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জীব জগতের বাক্য ও মনের অগোচর জানিয়াই সাধকের সাধনার সিদ্ধির জন্য তিনি স্বয়ং নানারূপে অবতীর্ণ হইলেন।

(৫৪) 'অক্ষ' শব্দে পঞ্চাশৎ বর্ণ বা মাতৃকাশক্তি বোঝায়। আদি বর্ণ 'অ' এবং অন্ত বর্ণ 'ক্ষ' বলিয়া ইহাকে 'অক্ষ' বলা হয়।

(৫৫) জীবনের চৌষট্টি (৬৪) মূল অভিব্যক্তি ৬৪ তন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি তন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকারিণী শক্তিকে যোগিনী বলা হয়।

(৫৬) পঞ্চ তত্ত্বের বিভাগ এইরূপ—(ক) তেজ আদ্যতত্ত্ব, (খ) পবন দ্বিতীয় তত্ত্ব, (গ) জল তৃতীয় তত্ত্ব, (ঘ) পৃথিবী চতুর্থ তত্ত্ব এবং (ঙ) জগদাধার অন্তরীক্ষই পঞ্চম তত্ত্ব।

(৫৭) তন্ত্র 'বিদ্যা' নামে অভিহিত। ইহার অনুশীলনে অমৃত লাভ হয়।

(৫৮) শিব-শক্তি বলিতে প্রজ্ঞা এবং জড়-শক্তির (Energy) মিলন বোঝায়।

(৫৯) শৈবাচার বলিতে বোঝায় যে জীবের লক্ষ্য শিবসমাধি—প্রজ্ঞাসমাধি বা আত্মায় সমাধি।

(৬০) কালিকা পুরাণে শিবকে অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার দার্শনিক তাৎপর্য্য এই যে কায়া ও ছায়ার মত শিব ও শিবানী কিংবা হর ও গৌরী একই অবিচ্ছিন্ন সত্ত্বা। যিনি শিব তিনিই শিবানী—শুধু ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

(৬১) কালীর ধ্যানে আছে—**"মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম"**; ছিন্নমস্তার ধ্যানে আছে—"দেবীর পাদপীঠে রতিকাম বিপরীত রতিতে মগ্ন"; এই রূপই শিব-শক্তির জাগতিক প্রকাশ। তান্ত্রিক চিন্তা অনুযায়ী কাম অর্থাৎ সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা জীব-জগতের পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতপক্ষে একই সত্ত্বা যেমন একরূপে শিব, তেমনি অন্যরূপে শক্তি। সহজভাবে বলা যায় যে সৃষ্টিমূল কাম জীবজগতে কখন পুরুষের আবেশ, আবার কখন প্রকৃতিনিষ্ঠ উন্মাদনা। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন শক্তির প্রাধান্য, জীবজগতের অবস্থা প্রায় একই রকম অর্থাৎ প্রকৃতির প্রাধান্য।

(৬২) **"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।**
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়॥"

কলিযুগে আগমোক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য পথে গমন করে, তাহার গতি নাই—ইহা যে অতি সত্য তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

(৬৩) **"নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।**
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায়চ সুখায়চ॥"

ইহলোকে বা পরলোকে সুখলাভের জন্য এমন অন্যপথ নাই, যেমন তন্ত্রোক্ত পথে ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হয়।

(৬৪) **"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥"**

সেই পরমাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারূপে মুক্তির হেতুভূতা এবং মায়ারূপে তিনিই আবার সংসার বন্ধনের হেতুভূতা। অতএব তিনি সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরী।

(৬৫) তন্ত্রে গুরুমুখে বুঝিয়া নিবার কথা বার বার বলা হইয়াছে। ইহার কারণগুলি এইরূপ বলিয়া মনে হয়।

(ক) তন্ত্র মুখ্যতঃ ক্রিয়ামূলক। ব্যবহারিক যোগ বা অন্যান্য ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ মানুষের নিকট হইতে উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণ না করিলে ক্রিয়া ফলপ্রসূ না হইতে পারে, এমনকি সাধকের দেহ এবং মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না।

(খ) প্রাচীনকালে লিপি প্রচলিত না থাকায় পুস্তকের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া গুরুপ্রমুখাৎ সব কিছু বুঝাশুনার নির্দ্দেশ ছিল।

(৬৬) শব্দব্রহ্ম হইতে আগত প্রতিটি স্পন্দনকে এক একটি বীজমন্ত্র বলা হয়। দেবদেবীর কল্পনার ভিত্তি এই স্পন্দন। আবার স্পন্দনের ধ্বন্যাত্মক রূপই বীজমন্ত্র।

এই স্পন্দনগুলি খণ্ডশক্তিরূপে পরস্পরের অতি নিকটবর্ত্তী থাকায় ইহাকে একটি অখণ্ড শক্তি বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ইহা কালশক্তি নামে অভিহিত এবং ইহাতে ধ্বনিগুলি বিধৃত।

ষট্ চক্র ভেদ

মানব দেহে গুহ্যমূল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত কয়েকটি চক্র মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। দেহের মধ্যে হাজার হাজার নাড়ী বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হইয়া প্রাণশক্তির বিস্তার লাভে সহায়তা করিতেছে। যোগশাস্ত্র মতে এই সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী গলিত অশ্বত্থ বা পদ্ম পত্রে

যদ্রূপ শিরা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অস্থিময় দেহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজসকল অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি নাড়ী মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। আবার সুষুম্না নাড়ীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে বজ্রনাড়ী নামে একটি সূক্ষ্ম নাড়ী এবং তদভ্যন্তরে চিত্রিণি নামে আরও একটি সূক্ষ্মতর নাড়ী বিদ্যমান। এই চিত্রিণি বা চিত্রাণী নাড়ীর অভ্যন্তরে আর একটি বিদ্যুদ্বর্ণা নাড়ী আছে; তাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। ইহা মূলাধার পদ্মস্থিত শিবের মুখবিবর হইতে উত্থিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্ম পর্যান্ত বিস্তৃত। যোগিগণ সবসময় এই ব্রহ্মনাড়ীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। কেহ কেহ এই চিত্রিণি নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলিয়া থাকেন। যাহা হউক এই চিত্রাণী বা ব্রহ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তির যাতায়াতের পথ। কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবেশদ্বারকে ব্রহ্মদ্বারও বলা হয়। তিনটি প্রধান নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না, যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামেও অভিহিত। মূলাধার চক্রে ইহাদের মিলিত স্থানকে যুক্ত ত্রিবেণী বলে। ইড়া নাড়ী সুষুম্নার বামদিকে এবং পিঙ্গলা নাড়ী ডানদিকে অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তির আরোহণের সময় ইড়া এবং পিঙ্গলা প্রতি চক্রে ডান হইতে বামে এবং বাম হইতে ডানদিকে প্যাঁচ দিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকিয়া এই তিন নাড়ী পুনরায় আজ্ঞাচক্রে মিলিত হইলে উহাকে বলা হয় মুক্ত ত্রিবেণী। চিত্রাণী নাড়ী আদ্যন্ত প্রণবযুক্তা। ইহা চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিস্বরূপ আদিতে এবং অন্তে পরিবৃতা মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্ম। ইড়া ও পিঙ্গলা আজ্ঞাচক্র হইতে পৃথকভাবে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। এই তিনটি প্রধান নাড়ী আজ্ঞাচক্র ছাড়া ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি ত্রয়েও মিলিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রী তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থে ষট্‌চক্র ভেদের বর্ণনা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সুপ্রসিদ্ধ

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবক্তা স্যার জন্ উড্রফে্র 'Serpent Power' গ্রন্থে মূল শ্লোকসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। আমরা এই পুস্তকে ষট্চক্র ভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। সাধকের আপন গুরু তদভাবে অন্য সমর্থ গুরুর আশ্রয় নিয়া ষট্চক্র ভেদের ক্রিয়ায় ব্রতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তদন্যথায় কোন ফল লাভ করা সম্ভবপর নহে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ষট্চক্র ভেদের পর সাধকের মনের অবস্থা চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন "ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তমভূমি। মন সেখানে গেলে লয়প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়, সমাধি হয়। দেহবুদ্ধি চলে যায়, বাহ্যশূন্য হয়। নানা জ্ঞান চলে যায়, বিচার বন্ধ হয়ে যায়।"

এখন আমরা প্রতিটি চক্রের ধারাবাহিক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

১। মূলাধার চক্র

মানবদেহের গুহ্যমূলের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নীচে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত স্থানকে কন্দমূল বা যোনি মণ্ডল বলে; তাহারই উপরিভাগে মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বয়ম্ভূলিঙ্গের অবস্থান। কুণ্ডলিনী শক্তি ঐ স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিন প্যাঁচে বেষ্টন করিয়া সর্পের ন্যায় আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্নাছিদ্রকে অবরোধ করতঃ প্রসুপ্তা অবস্থায় আছেন এবং তাঁহারই অভ্যন্তরে চিৎশক্তি বিরাজিতা। মূলাধার চক্র মানবদেহের আধারস্বরূপ বলিয়া ইহার অপর নাম আধার পদ্ম। এই পদ্মের অভ্যন্তরে অলির ন্যায় কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করেন। এই স্থানই সাধন ভজনের কেন্দ্র বা মূল। মূলাধার পদ্ম পৃথ্বি তত্ত্বের কেন্দ্র এবং বীজ মন্ত্র লং। এখানে ত্রিভুজাকৃতি যোনি আছে যাহা শক্তিপীঠ নামে অভিহিত। এই পদ্ম চতুর্দ্দলবিশিষ্ট চারিবর্ণাত্মক মাতৃকাযুক্ত (বং, শং, ষং, সং,)। এই পদ্ম ধ্যান করিলে আরোগ্য, কাব্য ও বাক্সিদ্ধি লাভ হয়।

২। স্বাধিষ্ঠান চক্র

ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এই পদ্ম ষড়দলবিশিষ্ট এবং ছয় বর্ণাত্মক বা মাতৃকাযুক্ত (বং, ভং, মং, যং, রং, লং)। এই কেন্দ্রের মূল তত্ত্ব অপ্ বা জল এবং বীজ বং। এই পদ্ম ধ্যান করিলে ভক্তি, প্রভুত্বাদি সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

৩। মণিপুর চক্র

ইহা নাভিদেশে অবস্থিত। এই পদ্ম দশদলযুক্ত এবং দশ-বর্ণাত্মক বা মাতৃকাযুক্ত (ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং)। এই চক্রের তত্ত্ব তেজঃ এবং মূল বীজ রং। তেজের জন্য এই পদ্ম মণির মত উজ্জ্বল দেখায় বলিয়া ইহার নাম মণিপুর। এই পদ্ম ধ্যান করিলে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়।

৪। অনাহত চক্র

এই পদ্ম হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বাদশ দল বিশিষ্ট এবং দ্বাদশ বর্ণাত্মক বা মাতৃকাযুক্ত (কং, খং, গং, ঘং, উং, চং ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং,)। এই স্থানটি হংসরূপী জীবাত্মার আবাসস্থল। এই চক্রের মূল তত্ত্ব মরুৎ বা বায়ু এবং বীজ যং। এইখানে ওঁকার অধিষ্ঠিত আছেন। যোগী সর্ব্ব প্রথম 'শব্দ' শ্রবণ করেন এই চক্রে। সাধারণতঃ দুইটি বস্তুর সংঘাতে শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই স্থানে সংঘাত ব্যতিরেকে শব্দ স্পন্দন হয়। তাই ইহার নাম অনাহত। এই চক্রের সামান্য নীচে একটি পৃথক পদ্ম আছে, তবে ইহা চক্র নয়। ইহা একটি উর্দ্ধমুখ পদ্ম মাত্র। এই স্থানে সাধক ইষ্ট-দেবতার মানস-পূজা সম্পন্ন করেন। এই চক্রে আছে ছয় কোণ বিশিষ্ট দুইটি ত্রিভুজ—একটি উর্ধ্বমুখী এবং অপরটি অধোমুখী। এই পদ্মের ধ্যানে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়।

৫। বিশুদ্ধ চক্র

ইহা কণ্ঠদেশে অবস্থিত। এই পদ্ম ষোড়শ দলবিশিষ্ট এবং ষোল বর্ণাত্মক বা মাতৃকাযুক্ত (অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং,

ঙ্গং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃ)। ইহার মূলতত্ত্ব ব্যোম বা আকাশ (Ether) এবং বীজ হং। এই পদ্মে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে সদাশিবের অবস্থান এবং তাঁহার কাছে সকলের মূলমন্ত্র বা বীজ মন্ত্র আছে। এখানে জীবাত্মা হংস দর্শনের দ্বারা পবিত্র বা বিশুদ্ধ হন। এইজন্য এই চক্র বিশুদ্ধ চক্র নামে অভিহিত। ইহা আবার বাক্‌দেবী বা ভারতীর স্থান নামে পরিচিত। এই চক্র বাক্‌শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী। এই চক্রের আকার বৃত্তের মত। এই স্থানে সাধক ত্রিকালদর্শী হন অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সবকিছু জ্ঞাত হইতে সমর্থ।

৬। আজ্ঞা চক্র

ইহা ভ্রূদ্বয় মধ্যে। এই পদ্ম দ্বিদলবিশিষ্ট এবং দুই বর্ণাত্মক বা মাতৃকাযুক্ত (হং, ক্ষং)। ইহার মূল তত্ত্ব মন (মানস) এবং বীজ প্রণব বা ওঁকার। ইহার অপর নাম জ্ঞান পদ্ম। এখানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানেই আত্মজ্যোতি দর্শন হয় যাহা সাধকের প্রতিবিম্ব।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ষষ্ঠভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতরে আলো—ছুঁতে পারে না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে।"

কুণ্ডলিনী তত্ত্ব

তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে কুলকুণ্ডলিনীও বলা হয়। 'কুল' এবং 'কুণ্ডলিনী' দুইটি শব্দের একই অর্থ—শক্তি বা মহাশক্তি। কুণ্ডলিনীকে আধার শক্তিও বলা হয়। সুবিখ্যাত তন্ত্র প্রবক্তা স্যার জন্ উড্‌রফ্ ইহাকে সর্প-শক্তি আখ্যা দিয়াছেন। এই শক্তি মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পাতা ইত্যাদি সবকিছুকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন। তন্ত্রাচার্য্যগণ কুণ্ডলিনী শক্তিকে মানবদেহের মূলাধার চক্রে প্রসুপ্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে 'যত্র

জীব তত্র শিব'—এই উক্তির রহস্য, অর্থাৎ পরমচৈতন্য শিব যে প্রতিটি প্রাণীর প্রকৃতরূপ, তাহা মায়া-আচ্ছন্ন সাধারণ জীবের বোধগম্য হয় না।

কুণ্ডলিনী শক্তির বিকাশ প্রথমে ধরা পড়ে পরানাদে। নাদের অপর নাম বাক্ বা শব্দ। শাস্ত্রবিদ্‌গণ পরানাদকে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামে চারি অংশে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম তিনটি অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা অব্যক্ত অবস্থায় আমাদের হৃদয়ে এবং চতুর্থটি অর্থাৎ বৈখরী বা স্থূল বাকের স্থান নির্ণয় হইয়াছে পৃথিবী লোকে। এইজন্য কুণ্ডলিনী তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের কাছে আত্মতত্ত্বের ন্যায় দুর্জ্জেয় এবং রহস্যাবৃত। আবার যাঁহারা কুণ্ডলিনী তত্ত্ব সম্যক্ অনুধাবন করিয়াছেন, সেইসব সাধকের কাছে এই তত্ত্ব অতীব সহজবোধ্য। সোজা কথায় বলা যায়—**'রসিক বিনা রসের মরম অন্যে বুঝে না'**।

কুন্‌ড্ ধাতুর অর্থ—জ্বলা, দহন ইত্যাদি।

কুণ্ড শব্দে গহ্বর বা গর্ত্ত বোঝায়।

কুণ্ডলিনী শব্দের আভিধানিক অর্থ—অভ্যন্তরে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি বিশেষ।

কুণ্ডলী (সর্প) = কুণ্ডল + ইন্ আছে অর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে কুণ্ডলিনী।
অন্য অর্থে সর্পের কুণ্ডলাকার বেষ্টনী বা বেড়।

পূর্ব্বোক্ত অর্থগুলি হইতে সর্পের সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ একটা সম্পর্কের আভাস মানস পটে ভাসিয়া উঠে। তদুপরি কুণ্ডলিনীর ভুজঙ্গিনী নাম এই ধারণাকে দৃঢ় করিয়া তোলে। এইসব কারণ হইতে সর্প পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে করা অস্বাভাবিক নয়। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীনকালে পৃথিবীর বহুস্থানে সর্প পূজার প্রচলন ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি অনুসারে উহা কায়সাধনায় রূপান্তরিত হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তিরূপিণী চৈতন্য ব্যপ্ত অবস্থায় বিরাজিত, তাহা মানবদেহের আধারেও অধিষ্ঠিত। অসীমের মধ্যে মহাশক্তির

ভাবনা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই সসীম মানবদেহে অবস্থিত মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর ধ্যান, ধারণা ও সাধনা নিঃসংশয়ে সহজতর হইবে। এই কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে শব্দব্রহ্মসহ অনেক কিছুর অভিব্যক্তি বা প্রকাশ।

মানবদেহের যোনিমণ্ডলে (গুহ্যমূল এবং লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী স্থানে) মূলাধার পদ্মের গহ্বরে ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে দক্ষিণাবর্ত্তে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া সর্পের ন্যায় আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্নাছিদ্রকে অবরোধ করতঃ কুণ্ডলিনী শক্তি পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে বিদ্যুল্লতাকার অর্দ্ধ ওঁকারের তুল্য। ইনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া শুধু গভীর ধ্যানগম্য। তাঁহার অবস্থান সর্ব্বপ্রকার প্রাণীদেহে। কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে চিৎশক্তি বিরাজিতা এবং ইনিই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণের প্রসূতি ব্রহ্মশক্তি। বাক্‌শক্তি তথা পঞ্চাশৎ মাতৃকা (অ বর্ণ হইতে ক্ষ বর্ণ পর্য্যন্ত) এই কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে উদ্ভূত। এই শক্তি প্রাণীদেহের জীবনীশক্তি বলিয়া অভিহিত।

কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগতির সময় প্রতিটি চক্রের মুখ্য তত্ত্বগুলি তাঁহার মধ্যে বিলীন হয় বলিয়া তন্ত্রের ভাষায় ইহাকে সংহার বা লয়ক্রম বলা হয়। আবার অবরোহণের সময় ঐ সব তত্ত্ব উদ্‌গীরণ ক্রমে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া উহা সৃষ্টিক্রম নামে অভিহিত।

কুণ্ডলিনী যোগ সাধনায় কিছুদূর অগ্রসর হইলে মানুষের একটি মৌল প্রেরণা কামকে সংযত করা সম্ভব। তখনই কাম প্রেমে রূপান্তরিত হয়। কুণ্ডলিনী যোগের চরম অবস্থায় চৈতন্য উপলব্ধির মাধ্যমে প্রাণশক্তিতে তরঙ্গ সঞ্চার হয়; যার ফলে বিশেষভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলে এক নূতন চেতনার আবির্ভাব হয়। এই চেতনাকে কুণ্ডলিনী তন্ত্রের যোগীরা বিশ্বচৈতন্য নামে অভিহিত করেন। প্রত্যেক সাধকের প্রাণে এক উন্নততর অনুভূতি লাভের তীব্র আর্ত্তি জাগে। স্নেহময়ী প্রকৃতি মা এই যোগ-ক্রিয়ার সাহায্যে

প্রাণের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। তখন সাধক এক দিব্য ভাবের অধিকারী অতীন্দ্রিয় জগতের বাসিন্দা।

সাধনকালে অগ্নিশিখারূপী জীবাত্মা হৃদয় হইতে নামিয়া মূলাধারে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে মিলিত হন। তৎপর উভয়ে একই সাথে ব্রহ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া উর্দ্ধগামী হন। তৎপর একে একে ছয়টি চক্র এবং তিনটি গ্রন্থি ভেদ করতঃ কুণ্ডলিনী সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত হন। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের ফলে দেহের মধ্যে এক প্রচণ্ড প্রাণতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শিব ও শক্তির মিলনের ফলে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত অমৃত সুধা ক্ষরিত হইয়া দেহভাণ্ড প্লাবিত হয়। সকল চক্রের দেবতাগণ এই অমৃত পান করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হন। সাধনায় পূর্ণতা লাভ করিয়া সাধক এক দিব্যভাবের অধিকারী হন, যার ফলে তিনি নিজেও আনন্দরসে বিভোর হন।

প্রতি চক্রে আরোহণের সময় সাধক সেই চক্রের বিচিত্র রূপের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন এবং তৎস্থানের নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধি তাহার আয়ত্তে আসে। সর্ব্বশেষে সহস্রারে উপনীত হইলে পর সাধক যে শুধু বহুপ্রকার সিদ্ধির অধিকারী হন তাহা নহে, পরন্তু শিব-শক্তির মিলনে অপার আনন্দের অমৃত ধারায় তাহার দেহ, মন, প্রাণ সহ সকল সত্ত্বা প্লাবিত হয়। সাধক তখন কেবলানন্দ রস পানে বিভোর।

"মূলাধারে চ যা শক্তির্গুরু বক্ত্রেণ লভ্যতে।
সা শক্তির্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদুচ্যতে॥"

মানবদেহের আধার পদ্মে যে শক্তিরূপা প্রকৃতি বিরাজিতা, তাঁহার তত্ত্ব গুরু মুখে বুঝিয়া নেওয়া দরকার। এই শক্তিরূপা দেবীই মুক্তিদায়িনী, এইজন্য ইহাকে বিদ্যাতত্ত্ব বলা হয়। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের অভ্যুদয়ে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে চিৎশক্তি বিরাজিতা। ইহার গতি দুর্লক্ষ্য। সদ্‌গুরুর কৃপা এবং স্বীয় সাধন বল দ্বারা সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন।

"সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভূঃ॥
ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।
ত্রিলোকা সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা ত্রিরেখা সা বিশিষ্যতে॥"

এই কুণ্ডলিনী দেবী সর্ব্ব বেদময়ী, সর্ব্ব মন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী এবং পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী। এই দেবী অবস্থাভেদে ত্রিগুণা, ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকা এবং প্রণবস্বরূপা।

জীবাত্মা কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে পঞ্চপ্রাণরূপে বিরাজিত। ইহাকে সযত্নে রক্ষা না করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মা প্রকৃতি হইতে স্থূলা প্রকৃতি পৃথক। মায়া প্রকৃতি অপরা বা নিকৃষ্টা, আর পরা প্রকৃতি উৎকৃষ্টা বা চেতনাময়ী। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে এই বিষয়ে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার পদ্যানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

"ভূমি বায়ু অহং জল তেজ ব্যোম আর।
প্রকৃতির অষ্টভেদ মন বুদ্ধি যার॥
পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি আমার।
জীবরূপে শ্রেষ্ঠ পরা জগৎ আধার।"

পরা প্রকৃতি পুরুষের যোগে বা সান্নিধ্যে ক্রমবিবর্তনের পথে অপরা প্রকৃতি হন। এই পরা প্রকৃতি মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নিত্যা। তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তি প্রদান করেন। তিনি সকলের ঈশ্বরী—বন্ধন ও মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী। এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে এই যে একই প্রকৃতি কিরূপে বন্ধন ও মুক্তির হেতু হইতে পারেন। শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার উত্তর দিয়াছেন—"একই সুন্দরী রমণী যেমন প্রিয়জনের সুখের,

সপত্নীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু, তেমনি মহাশক্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপে মুক্তি ও বন্ধনের হেতু।"

এই প্রসঙ্গে দেবী ভাগবতের একটি শ্লোকের সারমর্ম পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য দিয়ে দিলাম।

"হে মুনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদী মনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুইপ্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সংসারাসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণভাব, আর বাসনা পরিবর্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণভাব সমাশ্রয়পূর্বক আরাধনা করিয়া থাকেন।"

পরব্রহ্ম ও মহামায়ার অভেদ-তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—অগ্নির উষ্ণতা, সূর্য্যের কিরণমালা যেমন স্বভাবশক্তি, তেমনি পরাশক্তি পরব্রহ্মের স্বভাবশক্তি।

কুণ্ডলিনী শক্তি জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ। এই শক্তি ব্রহ্মনাড়ীর মুখ রোধ করিয়া প্রসুপ্ত থাকায় জীবাত্মা অবিদ্যায় সমাচ্ছন্ন এবং ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়। এই কারণে বলা হয়—'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে।' কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। গৌতমীয় তন্ত্রে আছে—"মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি যাবৎ জাগরিত না হইবেন, তাবৎকাল মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চ্চনা বিফল হইবে। পুণ্যফলপ্রভাবে সেই শক্তি দেবী জাগরিতা হইলে, মন্ত্র জপাদির ফলও সিদ্ধ হইবে।" সুতরাং কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদনের জন্য যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া সাধকের কাছে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হইবে।"

সাধারণ জ্ঞান

শঙ্করা একদিকে যেমন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপক ছিলেন, অপরদিকে তেমনি তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রচারক ও উপদেষ্টা ছিলেন। এই উক্তি রহস্যাবৃত। ইহাকে ভিত্তি করিয়া পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, ইহার সুমীমাংসার জন্য বিষয়টি ভবিষ্যৎ গবেষকদিগের উপর ন্যস্ত করা উচিত।

° ষট্‌চক্র ভেদের অনুভূতিতে আত্মার সঙ্গে আত্মার বিপরীত রমণ উপলব্ধিসাপেক্ষ বিষয়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"এই অবস্থা যখন হল, ঠিক আমার মতো একজন এসে, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল। ষট্‌চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।"

ষট্‌চক্রের ক্রিয়ায় আরোহণের সময় অধোমুখে অবস্থিত পদ্মগুলি বিকশিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখী হইল—ইহাই বিপরীত রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত।

° যাঁহার নিজের ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি হয় এবং ইহারা যাহাতে বিলীন হন, তাঁহার নাম নিত্যা প্রকৃতি। পুরুষকে পরমাত্মা বলে। উৎকৃষ্ট আত্মার নাম পরমাত্মা। এই আত্মা স্বকীয় ইচ্ছা বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির শরীররূপে প্রকাশিত হন, তাই তিনি পরমাত্মা বা উৎকৃষ্ট আত্মা; অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিরহিত হইয়া তত্তৎ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কর্ত্তা, তাই ইহাকে পরমাত্মা বলে। তিনি সমস্ত জগতকে জানিতেছেন অথচ তাহাকে কেহই জানিতে পারে না, এই কারণে তাঁহাকে আদিভূত প্রধান পুরুষ বলে। কিন্তু জীবাত্মা এক নহেন। তিনি পশু পক্ষ্যাদিভেদে অনন্ত। আত্মা শিব, বিষ্ণু, দুর্গাদি শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীক হইলেও বাস্তবিকপক্ষে ভিন্ন নহেন। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ ভিন্ন বলিয়া মনে করি।

তপোবীর না হইলে সাধন-সংগ্রামে জয়লাভ করা সম্ভব নহে। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং, শরীরং বা পাতয়েয়ং।" মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যিনি করেন, শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত রহস্য শুধু তাঁহারই অন্তরে ফুটিয়া উঠে।

আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রে আছে—"যুক্তিযুক্তমুপাদীত বচনং বালকাদপি।" বালকেরও মুখনিঃসৃত যুক্তিপূর্ণ বাক্য গ্রহণ করা উচিত। আবার অন্যত্র আছে—"যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" যুক্তিহীন বিচার হইলে ধর্ম্ম মীমাংসার হানি হয়। ঐ সঙ্গে শাস্ত্রের সাবধান বাণী সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।" যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত, তাহা তর্কে যোজনা করিবে না।

এখন বিবেচ্য—এই যুক্তি কোন্ যুক্তি। বিষয়বস্তু যে স্তরের, যুক্তিও সেই স্তরের হওয়া চাই। সহজ কথায় জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান লৌকিক যুক্তি দ্বারা বিচার করা চলে। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা—যাহার তত্ত্বসমূহ জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু ঊর্দ্ধে, তাহার যুক্তিপূর্ণ বিচার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সাধনাপুষ্ট জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধি।

যাহা অতীন্দ্রিয়, অনধিগত ও অচিন্তিত বিষয়ের প্রদর্শন-কর্ত্তা—তাহাই "শাস্ত্র"; অগাধ সমুদ্রচারী জলজন্তু যাহা দেখিতে পায়, আমরা চক্ষুষ্মান্ হইয়াও তাহা দেখিতে অক্ষম। তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা প্রাথমিক অবস্থায় বিনাবিচারে গ্রহণ করা উচিত।

একটি মুক্তা এবং একটি লাল জবা ফুল একত্র রাখিলে জবা ফুলের রক্তিম-ছটায় মুক্তা আরক্ত হয়, কিন্তু মুক্তার প্রভায় জবাফুল দেখিতে শুভ্র বলিয়া মনে হয় না। যে পদার্থ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ সে অন্যের প্রতিবিম্ব আকর্ষণ করিতে সক্ষম, কিন্তু যে মলিন সে নিজে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে—তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করার সামর্থ্য নাই।

○ যেমন প্রতি পর্ব্বতে মাণিক্য পাওয়া যায় না, প্রতি হস্তীর মস্তকে মৌক্তিক থাকে না, চন্দনও বনে বনে জন্মে না, সেইরূপ প্রকৃত সাধুও সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না।

ভগবান্ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিলেন —"প্রভু! বিবেকহীন সংসারী পুরুষ যেমন স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদির অনুধ্যান করে, তদ্রূপ আমি যেন পরম প্রীতিপূর্ণ ভাব নিয়া তোমাকে আমার অন্তরে অনুস্মরণ করিতে পারি।"

এখানে প্রহ্লাদ মূর্ত্তিমান ভগবানকে পাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ না করিয়া প্রার্থনা করিলেন তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি যেন সর্ব্বক্ষণ অটুট থাকে। প্রহ্লাদ ছিলেন চতুর ভক্ত। ভক্তির সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব, যার ফলে সর্ব্বব্যাপী ভগবানকেও ভক্তের বাঞ্ছানুযায়ী কৃতকৃতার্থ করিতে হইবে।

○ শব্দব্রহ্ম নাম নহে এবং জ্যোতির্ব্রহ্ম রূপ নহে। ইহা একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ। শুদ্ধ অহং-বোধের স্বরূপ ইহাই।

ভগবৎ সাধনাতে সিদ্ধিলাভ হইলে ভগবানের সঙ্গে মিলন সঙ্ঘটিত হয়। প্রকৃত নির্ব্বাণমুক্তি ইহার নামান্তর। ইহা সিদ্ধ অবস্থা হইলেও ইহাতে এমন একটি বস্তু আছে, যাহা চতুর্দিকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই বস্তুটি কৃপা নামে অভিহিত। ইহার সঠিক কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অতীব কঠিন ব্যাপার। সত্য এবং অহিংসার পথে চলিয়া সর্ব্বদা কৃপার প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়। দৈবাৎ আত্মতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

○ হংসঃ বা শ্বাস-প্রশ্বাস বা সৃষ্টি-প্রলয় আমাদের দেহাভ্যন্তরে নিরন্তর হইতেছে। যদি 'হং' এর বিন্দু এবং 'সঃ'-এর বিসর্গ গুরুদত্ত কৌশলে দ্বিদলে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে এক করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য সাধন সিদ্ধ হইল। ব্রহ্মের আচার বা আচরণই ব্রহ্মাচার বা ব্রহ্মচর্য্য।

দৃশ ধাতু জ্ঞানার্থক। অতএব দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান। যে বস্তু অনন্তাকারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত, সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বাকে দর্শনই আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। ইনি পরমাত্মা—কেবল অনুভব দ্বারা গ্রাহ্য। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—"আত্মাহবৈ গুরুরেকঃ"। "সাধারণতঃ জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী বলা হইয়া থাকে; এ স্থানে গুরু শব্দে বিশ্বগুরুর ইঙ্গিত করা হইয়াছে।"

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

১ "জঁাক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা, জানবে নাকো জগৎজনে।"

তন্ত্রে গোপনীয়তার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—এই গানের মধ্যেও ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান পরস্পর সংশ্লিষ্ট। বাক্‌শক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ। বাইবেলে আছে—"Let there be light and there was light." New Testament এ আছে—"The word was with God and the word was God."

মহাধীসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সাধনায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহার পাণ্ডিত্য ব্যর্থ হয়।

৩ আত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম একার্থবাচক। জীবাত্মা পৃথক না হইলেও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র। বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব—এর মধ্যে কোন ভেদ নাই। বুদ্ধিতত্ত্বে বা অন্তঃকরণে ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই জীব। মুক্তি হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বেই লীন হইবে।

ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলে দশমসূক্তে (৩।১০।৬২) যে সবিতৃ-ঋক্ আছে তাহা গায়ত্রী ছন্দে রচিত। ইহাকে গায়ত্রী মন্ত্র না বলিয়া সবিতৃ-ঋক্ বলা বাঞ্ছনীয়।

"ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাঃ জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষ বরাননে॥

৫ তীর্থ দর্শনের জন্য নারী পুরুষ সকলের আকর্ষণ অফুরন্ত। তীর—স্থা+ড প্রত্যয়যোগে 'তীর্থ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ

তীরস্থিত। "তীরস্থং তীর্থমিত্যাহুঃ।" জলাশয়ের জলরাশি এবং স্থলভাগের নিম্নাংশ যেখানে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে তীর বলা হয়। এই তীর সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের যোগসূত্র।

যাহা দ্বারা "আমি কে?" জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে 'সাংখ্য' বলা হয়।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রমতে সৃষ্টির নিয়ম বা রহস্য 'তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে যে 'তৎ' ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই 'তৎ' এর ভাবই 'তত্ত্ব'। সৃষ্টিক্রমকে এইজন্য 'তত্ত্ব' বলা হয়। এই 'তৎ' শব্দ দ্বারা এক শুদ্ধ এবং অখণ্ড চৈতন্য সত্বাকে বুঝায়।

আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে সব বেদের প্রথম উদ্‌গাতা ব্রহ্মা বা প্রজাপতি, কিন্তু আহ্নিক মন্ত্রে গায়ত্রী জপের শেষে যে মন্ত্রটি আছে তাহা এইরূপ :—

"মহেশ-বদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয় সম্ভবা।
ব্রহ্মণাসমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥"

উল্লিখিত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারি যে ইহা প্রথম মহেশ বা শিবের মুখ দিয়া প্রকাশ পায়।

অথর্ব্বই যে আদিমতম বেদ, প্রথম ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। অথর্ব্ব বেদের মধ্যে আদিম মানব সমাজের রীতি-নীতির বর্ণনা আছে। অথর্ব্ব বেদের প্রত্যেক ভাগকে কাণ্ড বলা হয়। কাণ্ড শব্দে বৃক্ষের অংশকে বুঝায়। ঋগ্বেদের ভাগগুলিকে মণ্ডল, যজুর্ব্বেদের ভাগগুলিকে অধ্যায় এবং সামবেদের ভাগকে আর্চিক বলা হয়। এইসব তথ্য হইতে অথর্ব্ববেদের প্রাচীনতা সমর্থিত হয়। তন্ত্রের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

তন্ত্রের দিগ্‌দর্শন (পর্য্যালোচনা)

মানব সমাজে শৃঙ্খলা, নীতি এবং ধর্ম্মের অবনতির সূচনা হইলে জগজ্জননী এবং জগৎপিতা অধঃপতিত মানব সমাজের কল্যাণার্থে তন্ত্রের অবতারণা করেন। জগন্মাতা নিজ সন্তানদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলা হইয়া মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে প্রভো! কলিযুগে যুগধর্ম্ম প্রভাবে মানুষ স্বভাবতঃই অতি দুর্বৃত্ত এবং পাপাচারী হইয়া উঠিবে। আপনি কৃপা করিয়া তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত উপায় বলিয়া দিন, যাহাতে তাহারা দীর্ঘজীবন, উত্তম স্বাস্থ্য, শক্তি, তেজ, সাহস ও পুরুষত্ব লাভ করিতে পারে; প্রকৃত বিদ্যা ও চিত্তের দৃঢ়তা লাভ করিয়া মহাবলীয়ান্, শুদ্ধচিত্ত, পরহিতে রত ও মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া মহৎ গুণের অধিকারী হয়, সেই পথের সন্ধান দিন।"

শিবানীর এই প্রার্থনার উত্তরে শিব বলিলেন যে জীবের মঙ্গল বিধান একমাত্র তন্ত্রোক্ত আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতির সাহায্যে এবং সাধকদের অনুসৃত পন্থাতেই সম্ভব।

এখানে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তন্ত্র বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন এবং অপৌরুষেয়। তন্ত্র সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। ইহা জীবকুলের অশেষ কল্যাণবিধায়ক। তন্ত্রে দুর্ব্বল মানুষের উপযুক্ত, সহজ, সরল, অল্প আয়াসে প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ, সাধন-পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ জাগতিক জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রাখিয়াও তন্ত্রের সাধনায় রত হওয়া যায় বলিয়া সংসারী ভোগমুখী জীবের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য। মূলতঃ তন্ত্র বেদবিরোধী নহে। সাংখ্য ও যোগদর্শনের অনেক কিছু তন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য ইহাদের সাহায্যে জগজ্জননীর উপলব্ধি সম্ভব। কিন্তু তন্ত্র এই বিষয়ে আর এক পা অগ্রসর হইয়াছে। তন্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনার ফলে মায়ের প্রত্যক্ষদর্শন এমন কি মায়ের সহিত কথোপকথন পর্য্যন্ত বাস্তবাকারে সম্ভব হইয়া থাকে। মহাজনেরা তন্ত্রশাস্ত্রকে কলিযুগের বেদ আখ্যা দিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তন্ত্রের দিব্যপ্রকাশ হইয়াছিল সারাবিশ্বে। বিশ্বজগতের মূল কারণ মহাশক্তি। তাঁহাকে মাতৃরূপে ধারণা, ধ্যান ও উপাসনা করা তন্ত্রের প্রধান উপজীব্য এবং শ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই এই সাধনধারা এবং চিন্তাপ্রবাহ মানবসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। সকলেই অবগত আছেন যে ব্রজগোপীরা ব্রহ্মস্বরূপিণী কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীমদভাগবতেও তন্ত্রোক্ত পূজা-পদ্ধতির উল্লেখ আছে। পুরাণসমূহ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ। একশ্রেণীর সাধকের মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তন্ত্রোক্ত যোগকে বহুভাবে জনসমাজের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিযুগে কালের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। বেদোক্ত কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য। বর্ত্তমানযুগে ইহার আচরণ প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনে মানুষের চিন্তাধারারও বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম অনুসারে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে আত্মার বিকাশ সাধন করা যায় না। প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও আধ্যাত্মিক রাজ্যে শিশুর মত হওয়া বিচিত্র নয়। আত্মার বিকাশের জন্য বিচার ও ভেদবৃত্তিসম্পন্ন বুদ্ধিকে এবং বিষয়-ব্যাকুল মনকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রত্যাহার করিয়া আনিতে হয়।

তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানে মনের একাগ্রতা ও প্রাণের আকুতি মিশ্রিত হইয়া এক লোকোত্তর অনুভূতির জন্ম দিয়াছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর সূর্য্যানন্দ মহারাজের কথায়—"পূজা অর্থে প্রীতি সম্পাদন—মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের আরাধনা করিতেছি এই অনুভূতিতে যখন সাধকের মন-প্রাণ-দেহ মাতৃময় হইয়া উঠে, তখনি সন্তানের মায়ের প্রতি অকপট আকর্ষণ এবং মায়ের সন্তানের প্রতি অপার্থিব, অন্তহীন স্নেহ এই দুইটিতে মিলিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মহামিলন সাধিত হয়। তান্ত্রিক পূজার প্রতি পদে হৃদয়াবেগ ও একাত্ম হইবার

প্রয়াস মিশ্রিত থাকায় সাধ্য ও সাধকের বিভেদ ঘুচিয়া সব একাকার হইয়া যায়।"

তন্ত্রশাস্ত্রের সঠিক মূল্যায়ণ আজ পর্যন্ত হয় নাই। আধুনিক বিদ্বৎসমাজের কাছে তন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার মূলে রহিয়াছে কিছুসংখ্যক প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের লেখনী নিঃসৃত কতকগুলি ভ্রান্তিমূলক বিবরণ বা রচনাবলী।

প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র একটি সুশৃঙ্খল সাধন-ধারা, সুসংবদ্ধ প্রণালী এবং অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রম। ইহার ভিত্তি হইল বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারশীলতা। তন্ত্রোক্ত তত্ত্বগুলি এবং ক্রিয়াদির ফল ভাব-জগতে প্রজ্ঞাশক্তির সাহায্যে নিজেই অনুভব করা যায়। আবার বাস্তবজগতে যোগসাধনার দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কিন্তু উল্লিখিত পণ্ডিতেরা এইসব সত্যভিত্তিক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তন্ত্রের এই সমস্ত বহুমুখী লোকোত্তর দানের দিক বিবেচনা না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সুবিধামত তন্ত্র হইতে এমন কতকগুলি বিশেষ সাধন-প্রণালী ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা লোক সমাজে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা আপাতদৃষ্টিতে ঘৃণ্য এবং বিরক্তিকর মনে হইবে। কিন্তু তন্ত্রাচার্য্যদের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহার পরিণাম খুবই ভাল হয়। এইসব ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের নির্দ্দেশ তন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্ত্র হুঁশিয়ার করিয়া বলিয়াছেন যে এই প্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়া সদ্গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ পথ অতীব পিচ্ছিল বলিয়া পদস্খলনের সম্ভাবনা সমধিক। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁহাদের একদেশদর্শী লেখার ফলে তন্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম মানুষের কাছে শুধু যৌন আবেদনে পর্য্যবসিত হইবে। এইসব সমালোচকেরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে তন্ত্রে নারীত্ব জননীত্বে রূপান্তরিত এবং কেন্দ্রীভূত। এই কারণে নারীর আসন তন্ত্রশাস্ত্রে এমন এক উচ্চপর্য্যায়ে স্থাপিত যে বিশ্বধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা এক

অতুলনীয় অনন্য অবদান হিসাবে পরিকীর্ত্তিত। বিশেষতঃ, তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে জীবনের গূঢ় রহস্য কামের বেগ সংযমেই নিহিত—কামোন্মাদনায় মৃত্যু অনিবার্য্য।

"মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ।"

প্রাচীনকালে প্রবর্ত্তিত কৃচ্ছ্রসাধনার শুষ্ক কঠোর নিয়মচর্য্যার বদলে তন্ত্র নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক পর্য্যায়ে এক উন্নততর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তন্ত্রমতে কামনা বাসনা পূরণ করিবার পন্থাগুলিকে ভোগ্যবস্তুর শোধন, নানাবিধ প্রাক্ অনুষ্ঠান ও বিধিবদ্ধ কঠোর নিয়মাবলীর দ্বারা এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে ভোগবাসনা এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্থূল হইতে সূক্ষ্মস্তরে উন্নীত হইয়া প্রশমিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যথাকালে সংযত এবং পরিমিত ভোগের দ্বারা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া মানুষ ত্যাগের পথে অগ্রসর হয়। এইভাবে ভোগের দ্বারা ভোগ বাসনাকে জয় করিয়া মানুষ দেবত্ব লাভ করে। দুঃখের বিষয়—তন্ত্রের মূল লক্ষ্য নিবৃত্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অনেকে যাহা কিছু কুৎসিত, যৌনসম্বন্ধীয়, ভৌতিক বা ঐন্দ্রজালিক, সেই সমস্ত বিষয়কে নির্বিচারে তন্ত্রের নামে চালু করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সত্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত করিয়া কিছু অসঙ্গত, অযৌক্তিক ঘটনাবলী লইয়া উদ্ভট কাল্পনিক গল্প সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত মিথ্যা প্রচারে তন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে তন্ত্র প্রকৃতপক্ষে এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সাধন-শাস্ত্র যাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু চিৎশক্তি। পারমার্থিক জীবনের প্রতি স্তরে ইহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের মধ্য দিয়া।

মননশীল ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রীসদেশীয় মনোবৃত্তির ও কৃষ্টির অনুরূপ বলিয়া বোধ হইবে। সক্রেটিসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্লেটো এথেন্সবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া

বলিয়াছিলেন—"পরীক্ষাবিহীন জীবনের কোন মূল্য নাই। পরলোকে আমি সত্য ও মিথ্যা জ্ঞান সম্বন্ধে আমার অন্বেষণ অব্যাহত রাখিব, কারণ সেখানে জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্নকে অপরাধ গণ্য করিয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।" তন্ত্রের বাস্তবানুগ ও সত্যান্বেষী প্রকৃতির দরুন অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া লব্ধ পরীক্ষিত সত্য ব্যতীত অন্য কিছু এই শাস্ত্রে গৃহীত হয় না। বিশেষতঃ তন্ত্র দাবী করে যে অভিজ্ঞতা বা ভূয়োদর্শন লব্ধ তথ্য ও তত্ত্বের সম্যক্ বিশ্লেষণ, পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও গবেষণা দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রম উৎকর্ষতা সাধিত হইলেই মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে। তখনি এক অপার্থিব অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মন সচেতন হয় ও দিব্যজীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে।

আমাদের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিয়া আত্মানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলে বর্ত্তমান বিশ্বের সঙ্কটময় পরিস্থিতির সমাধান বহুলাংশে সহজতর হইবে বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যগণের ধারণা। আধুনিক যুগসঙ্কটে বহু সমস্যার সমাধানে তন্ত্র প্রদর্শিত মৌলিক নীতিগুলির একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রকৃতি, মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতাকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে; যদিও ইহার লক্ষ্য সত্যান্বেষণের সাহায্যে প্রকৃতিমায়ের কৃপালাভ। ইহার বাস্তবানুগ মতবাদের প্রভাব ও ক্রিয়াদির প্রত্যক্ষ ফললাভ সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রমাণিত সত্য। এইজন্য ব্যবহারিক জগতে ইহার প্রয়োগ ব্যবস্থা করিলে সুফল প্রাপ্তি যে নিশ্চিত তাহাতে সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না।

মানব সমাজের আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্খার কথা বিবেচনা করিয়া তন্ত্রের মহান আদর্শ অনুধাবন করিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। অধ্যাত্মরাজ্যে তন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার মূল্য অপরিসীম।

তন্ত্রে কোন কিছুকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া অথবা মন্দ বলিয়া বর্জ্জন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। বরঞ্চ সব কিছুকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনের ব্যবস্থা তন্ত্রে আছে। ফলে চিৎ ও জড় জগতের অণুপরমাণু সকলেই তন্ত্রের দৃষ্টিতে সমভাবে মহনীয় ও বরণীয়। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা ও স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এইজন্য তন্ত্রে অধিকারীর প্রশ্নকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ইহা নির্ণয়ের ভার সর্ব্বজ্ঞ গুরুর উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

তন্ত্র এমন একটি প্রাণবন্ত দর্শনশাস্ত্র যাহার সুবিশাল ছায়ায় মানব সমাজ যুগযুগান্তকাল ব্যাপিয়া আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবনও পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এমন গতিময় শাস্ত্রের প্রভাব ও জীবন-চেতনা সুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রয়োগের ফলে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভয় ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। তবুও যাঁহাদের তন্ত্রশাস্ত্রে বুৎপত্তি আছে তাঁহারা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারেন যে বর্তমান যুগের এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত্তে বিশ্ববাসী একমাত্র তান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করিয়া সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারেন। নানা সমস্যা-জর্জ্জরিত হতাশ প্রাণে একমাত্র তন্ত্রই উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়া মানব সমাজের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ।

কালীর স্বরূপ

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ ডি. লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন—"বাস্তবিকপক্ষে ৺মায়ের স্বরূপ বর্ণনা অসম্ভব। তাঁহার অনন্তরূপ এবং প্রতি রূপই অনন্ত রহস্যময়। হৃদয়ে যোগমূলক জ্ঞানোজ্জ্বল ভক্তির বিকাশ না থাকিলে সাধকের পক্ষে তাঁহার কোন স্বরূপেরই দর্শন লাভ ঘটে না। তাঁহার প্রতি স্বরূপই চিদানন্দঘন—মন ও মায়ার অতীত। মায়ের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে শুধু ব্যক্তিগত পুরুষকারমূলক 'সাধনার' দ্বারা তাঁহার কোন রূপ কাহারো দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না।"

এই ঋষিবাক্য হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে আলোচনার বিষয়বস্তু অতীব কঠিন, এমনকি দুরারোহ। তথাপি সীমিত জ্ঞান নিয়া পাঠকবর্গের অবগতির জন্য অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

"কালং কলয়তি ইতি কালী"

যিনি কালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস বা আত্মসাৎ করেন তিনি কালী। মহাকাল কালীর এক ধ্বংসাত্মকরূপ। মহাপ্রলয়ের সময়ে সকল পদার্থকে কলন বা গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম "মহাকাল"। দেবী সর্ব্বসংহারক মহাকালেরও কলনকর্ত্রী বলিয়া ত্রিলোকে 'কালী' নামে প্রকীর্ত্তিতা। কলনের কর্ত্রী পরাদেবীই 'কালী' ও 'কালকর্ষিণী' সংজ্ঞায় অভিহিতা হন। একই ব্রহ্মের বিভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া 'কাল' ও 'কালী' পরস্পর অভেদ। যখন সৃষ্টির পূর্বে কেবল শূন্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না, তখন—"মহাশূন্যে মহাকালো মহাকালী যুতঃ সদা"। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"

'আমি ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় আর কেহ নাই।'

সকলের কালস্বরূপা এবং সকলের আদিভূতা অর্থাৎ কারণস্বরূপা বলিয়া দেবীকে সকলে 'আদ্যাকালী' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আবার

প্রলয়কালে বাক্যের অতীত, মনের অগম্য, তমোময়, নিরাকার, অব্যক্তস্বরূপ অবলম্বন পূর্বক এই দেবীই বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং তিনি সাকারা হইয়াও নিরাকারা এবং মায়া দ্বারা বহুরূপ অবলম্বন করিয়া থাকেন। যিনি রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্রী, সত্ত্বগুণ দ্বারা পালনকর্ত্রী এবং তমোগুণ দ্বারা সংহারকর্ত্রী—তিনিই ব্রহ্মাদি সকলের আরাধ্যা আদ্যাকালী সনাতনী।

দেবীর সূক্ষ্মরূপ বা স্বরূপ দেবতাদেরও গোচরীভূত নহে। তাঁহার স্থূল রূপের অর্চনা দ্বারাই সাধক মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। পাশবদ্ধ জীবের স্থূল দৃষ্টিতে দেবীর রূপ অতীব ভয়ঙ্কর; কিন্তু সাধকের কাছে মা সব সময়ই সন্তানবৎসলারূপে আবির্ভূতা হন। তিনি বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা ভাষা দ্বারা সম্ভব নহে। ব্রহ্মাদি দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রাণী এবং আমাদের গোচর বিচিত্র জগৎ এই মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহাতে স্থিত এবং পরিণামে তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি যে সাকাররূপে আমাদের কাছে আবির্ভূতা হন—সেই সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সংশয় থাকা উচিত নহে। তন্ত্রমতে জগন্মাতা কালীই ত্রিতাপহারিণী এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রদায়িনী। এক কথায়, কলিযুগে কালীকে বাদ দিয়া সিদ্ধির কথা ভাবও সম্ভব নহে।

আবার এই দেবীই নিরাকার স্বরূপে অজ্ঞেয় রূপ অবলম্বনে বাক্যের অতীত, মনের অগম্য। তিনি যেহেতু নিজ মায়া অবলম্বনে স্বেচ্ছানুসারে অনন্তরূপিণী, তখন তিনি যে নিরাকারা হইয়াও সাকারা, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। সাকারা অর্থে সাকার জীবের ন্যায় কোন বিশেষ আকারে আবদ্ধা নহেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। তিনি সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি কেহ নাই। তাঁহার কৃপায় আমাদের ত্রিগুণাত্মক মনের কবাট উদ্ঘাটিত বা অর্গলমুক্ত হইলে পর এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব।

যুগে যুগে মহাশক্তির এক এক মূর্ত্তি আদ্যা নামে পরিচিতা। তন্ত্রে আছে—

"সত্যেষু ত্রিপুরা আদ্যা, ত্রেতায়াং ভুবনেশ্বরী।
দ্বাপরে দ্বিতীয়া প্রোক্তা কলৌকালী প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
[দশমহাবিদ্যান্তর্গতা দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারা]

মহাকাল সংহিতামতে দক্ষিণা কালীই আদ্যাকালী। কলিযুগে তিনিই আদ্যাশক্তি। কার্য্য-কারণের কর্তৃত্বভেদে ব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিরূপে ত্রিধা বিভক্ত। শাক্ত মতে কালীই ব্রহ্ম। শাস্ত্রে আছে—তিনি একাধারে সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, সবিকল্প ও নির্বিকল্প। এবংবিধ বিরুদ্ধধর্ম কিভাবে তাঁহাতে সমন্বিত, ভাবিলে হতবাক্ হইতে হয়। সহজ কথায় বলা হয় তিনি সাকারা ও নিরাকারা। কখনো ব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত।

কালিকা স্বরূপতঃ এক হইলেও সাধকবৃন্দ আপন আপন সাধনলব্ধ অধিকার বলে তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্ন গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে—যেমন দক্ষিণাকালী, রক্ষাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি।

তন্ত্রে কালীকে নির্বিকারা, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশিকা, আদিরূপা ও সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী বলা হইয়াছে। দশমহাবিদ্যার সকল দেবী কালিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। তন্মধ্যে দক্ষিণা-কালী সকলের কারণ। **"সর্বাসাং সিদ্ধ বিদ্যানাং প্রকৃতির্দক্ষিণা প্রিয়ে।"**

০ দেবীর জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপ আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে--নিত্যধামে মহাকালী মহাকালের সহিত আলিঙ্গনাবস্থায় চণকাকারে অবস্থিতা। চণকের যেমন উপরিভাগে আবরণ এবং অভ্যন্তরে সমভাগে বিভক্ত পরস্পর সংশ্লিষ্ট দ্বিদল, পরব্রহ্মতত্ত্বও তদ্রূপ বহির্ভাগে নিজমায়ার আবরণে আবৃত এবং অভ্যন্তরে শিব-

শক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট। চণকের কোমল উজ্জ্বল দ্বিদল অপেক্ষা বল্কল যেমন মলিন ও কঠিন, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াও তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় শিব-শক্তি অপেক্ষা কঠিনা ও মলিনা। দ্বিদল ও বল্কলের একত্রিত নাম যেমন চণক, তদ্রূপ শিব-শক্তি ও মায়ার সমষ্টিগত নাম ব্রহ্ম। স্থূলদৃষ্টিতে বল্কলের বাহির হইতে চণককে এক বলিয়া মনে হইলেও বল্কল ভেদ করিলে চণকের অভ্যন্তরে অবস্থিত দ্বিদল যেমন গোচরীভূত হয়, ঠিক তেমনি মায়ার আবরণ ভেদকারী সাধনসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে শিব-শক্তির স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

প্রাচীন দক্ষিণাকালীর মূর্ত্তি বর্ত্তমানকালে প্রচলিত মূর্ত্তি হইতে সম্পুর্ণ পৃথক। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তন্ত্রোক্ত প্রাচীন মূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

নীচে পরমশিব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক; তদুপরি মহাকাল শিব সগুণ ব্রহ্মের প্রতীক। সর্বোপরি বিপরীত রতাতুরাভাবে কালীর অবস্থান।

যাহা হউক, তন্ত্রোক্ত প্রাচীন মূর্ত্তি উপরে আলোচিত ভাবধারার সঙ্গে খুব পরিষ্কারভাবে মিলিয়া যায়। ঐ মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলেই তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অনেকের ধারণা অধুনা বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত দক্ষিণাকালীর মূর্ত্তি সাধক চূড়ামণি শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময় (১৬-১৭ শতক) হইতে প্রচলিত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র নিজ নিজ শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণীর সহায়তায় আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি তদীয় মানস পুত্র এবং মানস কন্যা। যে কোন একের দ্বারা সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব নয়। তারপর স্ত্রী ও পুরুষের দ্বৈত সংযোগে সৃষ্টির আনন্দ পূর্ণভাবে ভোগ করার বিধান দিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা।

আনন্দলাভ এবং আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শিব ও শিবার মিলন। এই কারণে আদিভূতা সামরসবিভোরা মহাকালীর মহাকাল সহযোগে রতিক্রীড়ার অভিনয়।

"একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং"

অতএব স্থূল সূক্ষ্ম—উভয়ভাবই আমাদের ভাবনা চিন্তার বিষয়। পরমব্রহ্মের সিসৃক্ষা (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) হইতে যে ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব তাহাই কালী নামে অভিহিতা। আদিতে এই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ হওয়ায় মা আদ্যাশক্তি নামে পরিচিতা। সৃষ্টির আদিতে তিনি তমোরূপে অদৃশ্য এবং অব্যক্ত—যাহা বাক্য এবং মনের অগোচর। আবার তিনিই জগতের উৎপত্তির কারণ (হেতুভূতা সনাতনী)। যখন আকাশ, বাতাস, সলিল ইত্যাদি সবকিছু পরব্রহ্মে লীন, তখন দিক, দেশ, কাল সবই ঘোর তমশায় আবৃত। আবার মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখন এই দেবীই অবশিষ্ট থাকেন। এই দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা সুকঠিন। তথাপি আমাদের মানসিক আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য সামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে।

দেবীভাগবতে আছে—সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর তপস্যায় মধুকৈটভ দেবীর নিকট হইতে ইচ্ছামৃত্যু-বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কমলাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে, ব্রহ্মা মহাভীত হইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিয়াও জাগরিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা তখন চিন্তা করিলেন—বিষ্ণু নিশ্চয়ই মহাশক্তি কর্তৃক যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। তখন ব্রহ্মা সেই মহাশক্তির স্তব-স্তুতি করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া দৈত্যদ্বয়ের বিনাশার্থ অতুলতেজা বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করতঃ অন্তর্দ্ধান করিলেন। বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ করিয়াও যখন দৈত্যদ্বয়কে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তখন দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন। দেবী পরম প্রীতি লাভ করিয়া

নারায়ণকে বলিলেন—"এই বীরদ্বয়কে বিমোহিত এবং বঞ্চিত করিয়া বধ করিতে হইবে। নারায়ণ! আমি কুটিল কটাক্ষ ক্ষেপে ইহাদিগকে মোহিত করিব; তৎপর আমার মায়া-মোহিত অসুরদ্বয়কে তুমি শীঘ্র বিনাশ করিবে।"

অতঃপর তুমুল যুদ্ধ বাধিল। এই সময় নারায়ণ কাতর নয়নে দেবীর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইলেন। দেবী নয়নত্রয়কে সমধিক আরক্ত করিয়া অসুরদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক হাস্য করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাম-প্রেম-ভাব সংমিশ্রিত ঘন ঘন কুটিল কটাক্ষে মর্মে মর্মে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে অসুরদ্বয় বিমোহিত হইলে বিষ্ণু সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাদের বীর্য্যবল ও রণনৈপুণ্যে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তোমাদের বাঞ্ছিত বরপ্রদানে আমি আগ্রহী।" বিষ্ণুর বাক্যে অভিমানান্ধ হইয়া দৈত্যদ্বয় উত্তর করিল—"আমরা যাচক নহি, বরং আমরা তোমাকে বর দিতে প্রস্তুত।" বিষ্ণু তখন বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"তোমারা আমার বধ্য হও।" ইহাতে দৈত্যদ্বয় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া অবশেষে বিষ্ণুকে বলিল—"তুমি ইতিপূর্বে যে বরদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, এক্ষণে জলশূন্য এবং অতি বিস্তৃত স্থলভাগে আমাদিগকে বধ করার জন্য বর প্রদান ক্রমে আপন সত্য রক্ষা কর।" অতঃপর ভগবান বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্র স্মরণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন—"তাহাই হইবে।" এই বলিয়া নারায়ণ নিজ উরুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া সেই একার্ণব জলোপরি নির্জল স্থলভাগ প্রদর্শন করিয়া দানবদ্বয়কে বলিলেন—"এক্ষণে তোমরা সত্য রক্ষা কর।" দৈত্যদ্বয় এবার কৌশল হিসাবে নিজ নিজ দেহ সহস্র যোজন বর্দ্ধিত করিল। ইহা দেখিয়া বিষ্ণুও আপন জঘনদ্বয় তাহার দ্বিগুণ বিস্তৃত করিলে মধুকৈটভ নিজেদেরকে বিজিত মনে করিয়া নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিল। অনন্তর বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা দৈত্যদ্বয়ের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন।

সুরাসুর নিখিল জীব জগতে এই দেবীই সকলের আরাধ্যা

পরমা শক্তি। সগুণরূপে হউক অথবা নির্গুণরূপেই হউক, সেই পরমা শক্তিই পূজনীয়া।

সাধকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে বাসনা হয়—

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে মা
কটাক্ষে হেরিয়ে।
আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে
উদরে পূরিয়ে।
সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।।"

এই দেবী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া মনে পড়িল "যদি সিন্ধুরূপী মসীপাত্রে কৃষ্ণ পর্ব্বতের পরিমাণ কালি থাকে, স্বর্গের কল্প-বৃক্ষের শাখা দ্বারা যদি লেখনী প্রস্তুত হয়, কাগজ যদি ভূভাগ সদৃশ হয় এবং স্বয়ং সরস্বতী দেবী চিরকাল লিখিতে থাকেন, তথাপি তোমার গুণকীর্ত্তন সমাপ্ত হইবে না।"

তাই অধম সন্তানের আকুতি—"মা জগদম্বা প্রসন্না হও।"

দক্ষিণ কালিকা দেবীর ধ্যান

(সর্বমন্ত্রে ব্যবহৃত)

১। (বীজ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত-ধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তা-লম্বিকচোচ্চয়াম॥
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্॥

[একাক্ষর এবং ত্র্যক্ষর মন্ত্রের জন্য পৃথক ধ্যান]

২। শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

ধ্যানমন্ত্রে ব্যবহৃত তাৎপর্য্যপূর্ণ শব্দরাশির শাস্ত্রানুগত ব্যাখ্যা একে একে পাঠকবৃন্দের কাছে উপস্থিত করা হইতেছে।

অনুবাদ

১। দেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী, চতুর্বাহুযুক্তা, বাম অধো হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড এবং ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ; দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় এবং অধো হস্তে বর মুদ্রা। মহামেঘপ্রভাযুক্ত শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী। গলদেশে মুণ্ডমালার রক্তে সর্বশরীর রঞ্জিত। কর্ণদ্বয়ে দুইটি শব (মতান্তরে শর বা বাণ) আভরণরূপে শোভিত। করাল-বদনা ও ভীষণ দন্তশ্রেণী। পয়োধর পীন ও উন্নত। কটিদেশে কাঞ্চিমেখলারূপে শবের হস্তশ্রেণী। হাস্যমুখী; ওষ্ঠাধরের প্রান্তদেশ হইতে গলিত রুধিরধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। তাঁহার রব অতি গম্ভীর, শ্মশান তাঁহার আলয়। তিনি ত্রিনেত্রা, প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় লোহিত ও উজ্জ্বল নেত্র। দন্তশ্রেণী উন্নত। দক্ষিণা-ভিমুখী লম্বমান আগুলফ মুক্তকেশরাশি। শবরূপ মহাদেবের উপর অবস্থিতা। চতুর্দ্দিকে শিবাগণ বিকট শব্দ করিতেছে। মহাকালের সহিত বিপরীতরতাতুরা। হাস্যযুক্তা ও প্রসন্নবদনা।

২। দেবী শবরূপ শিবের উপর অবস্থিতা, ভীষণাকৃতি, দন্তশ্রেণী ভয়ঙ্কর, বরপ্রদা, হাস্যযুক্তা, ত্রিনয়না, মুক্তকেশী, জিহ্বা বাহির হইয়া আছে, রুধিরপানে রত; চারিহাতে কপাল, কর্তৃকা, বর ও অভয় মুদ্রা।

মন্তব্য ঃ—নিজ নিজ গুরুদেবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সকল সিদ্ধিদায়িনী দক্ষিণ কালিকা দেবীর ধ্যান করিতে হয়। আবার পূজার সময় খড়্গ, মুণ্ড, বর, অভয় এবং লেলিহান মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক কূর্মমুদ্রায় ফুল গ্রহণ করিয়া ধ্যান পাঠ করিতে হয়।

দেবীর রূপকল্পনার সংক্ষিপ্ত অর্থ/ব্যাখ্যা

কালবর্ণা—দেবী মেঘবরণা। গাঢ় মেঘের বর্ণ কালো; তাই কালী কৃষ্ণবর্ণা। শ্বেত, পীত ইত্যাদি বর্ণ সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদয় পদার্থ কালীতে লয়প্রাপ্ত হয়। এমন কি মাতৃ-সাধকের ইহকাল, পরকালের সব দায়িত্ব মা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদে আছে— সৃষ্টির পূর্ব্বে শুধু কৃষ্ণবর্ণ তমঃই ছিল। দেবী কালীই সেই আদি তমঃ। কালী বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এবং মহাপ্রলয়ের পর একমাত্র তিনিই বিদ্যমান থাকিবেন। এই কারণে দেবী অদ্বিতীয়া। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—দূর হইতে দেখিলে কালী কালো; কিন্তু সাধক যতই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবে ততই তাহার অনুভব হইবে যে কালীর কোন বর্ণ নাই।

পরাশক্তি অরূপা কালীকে কোন বর্ণ দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তিনি বর্ণাতীতা বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা ছাড়া অন্য কোন বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তাই মা 'কৃষ্ণবর্ণা'।

প্রখর জ্যোতি সাধারণ চক্ষুর গ্রহণ-শক্তির বহির্ভূত বলিয়া তাহার সম্মুখীন হইলে সেই জ্যোতিকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মনে হয়। আবার জ্ঞান-নেত্র পরিস্ফুট হইলে দেবীকে মহাজ্যোতিঃ রূপে দর্শন সম্ভব; কিন্তু অপরের নিকট মহাজ্যোতিঃ কালী কৃষ্ণবর্ণা। এই কৃষ্ণবর্ণেই সন্তানের কাঁচা আমি বিলীন হয়। তখন সাধককণ্ঠে উদ্‌গীত হয়—

"মা আছেন, আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার,
মায়ের দেওয়া খাই পরি, মা নিয়েছেন সকল ভার।"

ত্রিনয়ন—চন্দ্র বা সোম তিথিরূপ কালের এবং সূর্য্য অহোরাত্র কালের সম্পাদক। এইরূপে যে দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়—সেই দিবা সূর্য্যস্বরূপ, রাত্রি চন্দ্রস্বরূপ এবং সন্ধ্যাদ্বয় অগ্নিস্থানীয়।

ইহাই কালীর অগ্নি-সোম-সূর্য্যাত্মক তিনটি নেত্র। একই সঙ্গে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রতি মায়ের চাহনি—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং দিব্যদৃষ্টিরূপে। তাই মা 'ত্রিলোচনা'। ইহা আবার '**বালার্কমণ্ডলাকারা**'। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড রশ্মি মোটেই আরামদায়ক নহে। তাই মায়ের নয়নত্রয় প্রভাতকালীন স্নিগ্ধ অথচ মনোহর সূর্য্যালোকে পরিপূর্ণ এবং পরিশোভিত। অন্যমতে, সন্তানবৎসলা মা তিনচক্ষু দ্বারা যুগপৎ ত্রিলোকে সন্তানদের উপর সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন।

ঘোরা—প্রলয়াবসানে সৃষ্টিবিরোধী 'ঘোর' নামক দৈত্যের নিধনে মা 'ঘোরা' নাম ধারণ করেন। আতিশয্য অর্থেও ঘোর শব্দের প্রয়োগ হয়—যেমন ঘোর বিপদ বা কষ্ট। তাই বিপদ-নাশিনী মা সমস্ত বিপদাপদ দলন করেন বলিয়া মা 'ঘোররূপা'।

মুক্তকেশী—'ক্' বর্ণে সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, '**অ**' বর্ণে পালনকারী বিষ্ণু এবং 'ঈশ' শব্দে সংহারকারী মহেশ্বরকে বুঝায়।

ক্ + অ = ক এবং ক + ঈশ = কেশ।

সুতরাং কেশ বলিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই দেবতাত্রয়কে বুঝায়। মা যখন এই তিন দেবতাকে আশ্রয় দিয়া মুক্ত করিয়াছেন, তখন চরণাভিলাষী সন্তানের ভয় কোথায় ?

"দেবিপদাম্ভোজ সমাশ্রিতানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।"

যে সন্তান শ্যামাপদ কোকনদসার করিয়াছে, তার মনেও নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে মাঝে মাঝে—যেমন ভক্তের মুখে শুনি—

"আর কিছু ধন চাইনে শ্যামা,
বিনে দু'টি চরণ রাঙা,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
শুনে হ'লেম সাহস ভাঙ্গা।"

কেশরাশি এই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া ভাবিল—

"আমরা কেন মাথায় থাকি ? অশরণের শরণ যখন ঐ শ্রীচরণ-যুগল—আমরাও তথায় লুটাইয়া পড়ি।" এইজন্যই মায়ের কেশজাল আগুল্ফলম্বিত।

কালী নিজে মায়াতীতা হইয়াও অনন্তকোটি জীবকে মায়া পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার মুক্তকেশজাল দ্বারা। তাই মায়ের কেশজালকে মায়াপাশের প্রতীক বলা হয়।

আবার নৃত্যকালে কবরী কখনও বদ্ধ অবস্থায় থাকিতে পারে না; সমস্ত কেশরাশি মুমুক্ষু বলিয়া আপনা হইতে খুলিয়া পড়িল, নৃত্যরতা মায়ের চরণযুগলে।

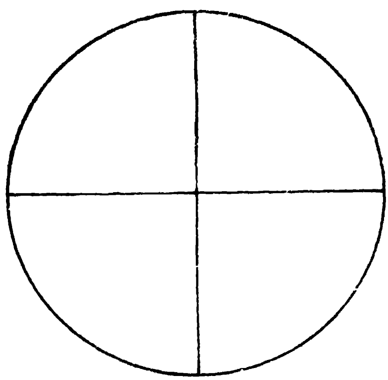
অন্যমতে, সব প্রসূতি প্রসবকালে আলুলায়িত কেশা। মা হইলেন বিশ্বপ্রসবিনী। তাঁহার অবকাশ কোথায় কেশবন্ধনের ? আবার যিনি নির্বিকারা তাঁহার কেশবিন্যাসাদির যত্ন না থাকাই স্বাভাবিক। তাই মা 'মুক্তকেশী'।

চতুর্ভুজা—কোন কিছু ধারণ করার জন্য হাতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। মা চারি হস্ত দ্বারা চারি বেদ, কখনও বা চারি যুগ-নিয়ন্ত্রণের জন্য বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও আগম ধারণ করেন। আবার ভবভয়ে ভীত সন্তানদিগকে রক্ষা করার জন্য চারি হস্ত প্রসারিত করিয়া চারিদিক রক্ষা করিতেছেন; কখন বা চতুর্বর্গ ফলদানে নিরতা।

অশিব-নাশনের প্রতীক হিসাবে মায়ের বামহস্তদ্বয়ে খড়গ এবং মুণ্ড। আবার খড়্গ জ্ঞানের প্রতীক বলিয়া নিষ্কাম সাধকের মোহপাশ ছিন্ন করার অস্ত্র। মোহমুক্ত সাধক নিজেকে মাতৃচরণে নিবেদিত করিয়া থাকেন। মুণ্ড তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক বলিয়া দেবী উহা নিজ হস্তে ধারণ করেন। নিষ্কাম সাধক আপন মোহ দূরীভূত হওয়ার পর এই ধনে ধনী হন। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের সাহায্যে আর্ত্ত এবং মুমুক্ষু সন্তানদিগকে অভয় এবং অভীষ্ট বরদানে কৃতার্থ করেন। অভয়দানের অর্থ বিপদমুক্ত করার আশ্বাস প্রদান এবং বরদানের অর্থ স্ব স্ব

কর্ম্মে প্রেরণা দান। দেবী হস্তচতুষ্টয়ের সাহায্যে সন্তানের ভক্তি উপহার মহোল্লাসে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দেবীর পূর্ণতা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে মহাকাশরূপিণী বলা হইয়াছে। মহাকাশের দিগ্‌বলয় তথা বৃত্তাকার চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু সহজতর হইবে। বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য দিয়া ৯০ ডিগ্রির ব্যবধানে দুইটি সরলরেখা অঙ্কিত করিলে পূর্ণ বৃত্তটি চারিভাগে তথা চারিভুজে বিভক্ত হয়। এইভাবে পূর্ণরূপা মহাকালীকে চতুর্বাহু-যুক্তা কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত মনে হয়।



বৃত্তের চারি ভাগ

আবার সাধক কণ্ঠে এই ভাবটির পূর্ণাঙ্গ রূপদান পাঠকবৃন্দকে উপহার দিলাম—

“দানব নাশিতে অসিমুণ্ডধরা,
ভকতের তরে বরাভয় করা।
ভীষণ মধুরে অপরূপ তারা,
হেরিলে প্রাণ জুড়ায় রে।”

তাই মা ‘চতুর্ভুজা’ নামে অভিহিতা।

কালিকা—বৎসর, ঋতু, দিবা-রাত্রি, তিথি, শৈশব, যৌবন ইত্যাদি সর্বপ্রকার কালকে মা সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। এক কথায় কালের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্রী বলিয়া মা ‘কালিকা’ নামে পরিকীর্ত্তিতা।

দক্ষিণা—অতি সহজে সন্তানবৎসলা মায়ের আনুকূল্য লাভ হয় বলিয়া মা 'দক্ষিণা' নামে অভিহিতা।

দশ দিক্‌পালের মধ্যে যমের আলয় দক্ষিণ দিক। মায়ের ভক্ত-সন্তান যাতে যমালয়ের দিকে না যান, তার প্রতি মায়ের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি। এমনকি দক্ষিণ দিকের অধিবাসী রবিসুত বা যম মায়ের ভয়ে পালাইবার জন্য ইতস্তত ছুটিতে থাকেন। তাই মা 'দক্ষিণা'।

চণকাকারে দ্বিধা বিভক্ত ব্রহ্মের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ এবং বাম ভাগ শক্তি। তন্ত্রমতে দক্ষিণ বা পুরুষ সংসার-প্রবৃত্তি ও বন্ধনের হেতু এবং বাম বা নারী সংসার-নিবৃত্তি ও মুক্তির হেতু। যতদিন উভয়ে সমবলে অবস্থিত ততদিন মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। সাধনার ফলে জাগরিতা বামাশক্তি দক্ষিণশক্তি পুরুষকে জয় করিয়া হর-হৃদিপদ্মোপরি দক্ষিণপদ স্থাপন করিয়া সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়াই মা 'দক্ষিণা'।

আজন্ম শুভাশুভ কর্মের পরিসমাপ্তিতে ফল লাভের জন্য মাতৃ-চরণে দক্ষিণা নিবেদিত হয় বলিয়া মা 'দক্ষিণা' নামে অভিহিতা।

"নির্গুণঃ পুরুষঃ কাল্যা স্থজ্যতে লুপ্যতে যতঃ
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।"

গুণাতীত পুরুষ মহাকালকেও সৃষ্টি ও বিলীন করিতে তিনি দক্ষিণা ও কুশলা। এইজন্য তিনি ত্রিলোকে 'দক্ষিণা' কালী বলিয়া কীর্ত্তিতা।

দক্ষিণা মূর্ত্তি নামক ভৈরবের আরাধিতা বলিয়া মা 'দক্ষিণা' নাম ধারণ করিয়াছেন।

একমতে কৃষ্ণা ও রক্তা ভেদে কালী দুই প্রকার। কৃষ্ণা বা শ্যামা কালীই দক্ষিণা কালী। রক্তা কালী সুন্দরী নামে অভিহিতা।

মুণ্ডমালা—**"মহাশূন্যে স্থিতা কালী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী"**। সৃষ্টির মূল—পঞ্চাশৎ বর্ণ, যাহা মাতৃকা-শক্তি নামে পরিচিত। এই পঞ্চাশৎবর্ণময়ী দেবী হইতে শব্দ তথা জগৎ সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে দেবীতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। এইজন্য দেবীকে শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী

বলা হয়। এক বা একাধিক মাতৃকাবর্ণের সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বীজ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য কালী নিজে সর্বদেবময়ী। মা এই পঞ্চাশৎবর্ণকে মুণ্ডমালারূপে ধারণ করিয়াছেন এবং ইহাদের দ্বারা বিভূষিতা হইয়াছেন। এই ভাবটি সাধক কমলাকান্তের একটি গানে খুবই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গানের প্রথম চারিটি লাইন এইরূপ—

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশিভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥"

অন্যমতে, বাহ্যতঃ প্রতিকূল শক্তির প্রতীক অসুরকুল দলন করিয়া মা কৃপাপরবশে তাহাদেরই ছিন্ন মুণ্ড মালারূপে নিজ বক্ষোপরি ধারণ করিয়াছেন সন্তানজ্ঞানে। ইহাই সমরে নিষ্ঠুরতা, কিন্তু অন্তরে সন্তানের প্রতি অহেতুক কৃপা। শ্রী শ্রী চণ্ডীর ভাষায় বলা যায়—

"বরদে! হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, ত্রিভুবনে একমাত্র তোমাতেই পরিদৃষ্ট হয়।"

দিগম্বরী—প্রসূতবিশ্ব মার কাছে শিশু সন্তান ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাহাদের সামনে মা অনায়াসে উলঙ্গিনী হইতে পারেন। লজ্জা নিবারণের জন্য বাহ্যিক আবরণের আবশ্যক নাই। মা নিজেই লজ্জাবীজ বা মায়াবীজ স্বরূপিণী।

প্রসবকালে প্রসূতি উলঙ্গিনী থাকেন। মা বিশ্বপ্রসবিনী বলিয়া তাঁহার বহিরাবরণ ব্যবহারের সুযোগ কোথায়?

আবার সদা আসবপানোন্মত্তা মা নৃত্যলীলায় মত্ত থাকায় নিজ বসনের প্রতি তাঁহার মোটেই ভ্রুক্ষেপ নাই।

দশদিক যখন মায়ের অম্বর, তখন বস্ত্রস্বরূপ অম্বরের বেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী মাকে উলঙ্গিনী ছাড়া কিভাবে দেখিতে পারে?

আমরা বাসনারূপ বসন দ্বারা নিজ নিজ নয়নযুগলকে বাঁধিয়া রাখার ফলে মায়ের যথার্থ রূপের সন্ধান লাভে বঞ্চিত। পাশবদ্ধ জীবের পক্ষে মার কাছে ঘেঁষা দুরূহ ব্যাপার। যাহার আঁখির কবাট খুলিয়া গিয়াছে তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—"মার না আছে আবরণ, না আছে আভরণ।"

পূজাকালে সোত্তরীয়-বস্ত্রদানের বিধি আছে।

মন্ত্রটি এইরূপ ঃ

"সর্ব্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে॥"

যদিও তোমার কোন আবরণ নাই, তথাপি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া দ্বারা নিজ তেজ অপরের অগোচর করিয়া রাখিয়াছ, এই অবস্থায় আমি তোমায় পরিধানের জন্য বস্ত্র অর্পণ করিতেছি। তোমাকে নমস্কার।

দেবী স্বরূপতঃ অসীম, অনন্ত বলিয়া কোনও কিছু দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করা সম্ভবপর নহে। এমন কি সূক্ষ্ম আবরণ মায়াও তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না। কারণ, তিনি মায়াতীতা পূর্ণব্রহ্মময়ী; স্বয়ং মায়াতীতা হইয়াও মায়াজাল বিস্তার করিয়া জীবকুলকে বদ্ধ করিয়া রাখেন। লীলাময়ীর লীলা অনন্ত।

করালবদনা, লোলজিহ্বা ও ঘোরদংষ্ট্রা—মায়ের লোলজিহ্বা সংহাররূপের দ্যোতক। সর্ব্ব-সংহারক কাল মায়ের দন্তস্বরূপ অর্থাৎ কালরূপ দন্তসহযোগে সংহারকালে চর্ব্বণ করেন। কালী শবাসনা, আর শব হইলেন সদাশিব। যিনি কালীর মহাপ্রেত পদ্মাসন, তিনি মহাকালরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করেন। আবার অসীম কালকে যিনি গ্রাস করেন, তিনি যে করালবদনা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বা ভীতির কিছু নাই। প্রকৃত সন্তান আপন মায়ের ভীষণাকার রূপে কদাচ ভীত হইবে না। সিংহ বা ব্যাঘ্র শাবক নিজ নিজ মাকে দংষ্ট্রা-করালবদনা দর্শনে ভীত হওয়া দূরের কথা—ইহা দৃষ্টে তাহাদের অপার আনন্দ উপজাত হয়।

'করাল' নামক অসুরের আস্য বা বদনমণ্ডল করে ধৃত বলিয়া মা 'করালাস্যা'।

দেবী তাঁহার ভয়ঙ্কর দন্তরাজি দ্বারা স্বীয় রক্তবর্ণ লেলিহান জিহ্বা দংশন করিতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি প্রথমে রজঃ গুণের বৃদ্ধি করিয়া তমোগুণ নষ্ট করেন এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা রজোগুণ বিনষ্ট করেন। দেবীর রক্তবর্ণ লেলিহান জিহ্বা রজোগুণের দ্যোতক এবং বিশাল দন্তরাজি সত্ত্বগুণের আধিক্য-জ্ঞাপক। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া নির্গত রক্তধারা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে দেবী রজোগুণসূচক রক্তধারা রহিতা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বিরজা।

পীনোন্নত পয়োধরা—ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র জীবনরক্ষার জন্য সন্তানের প্রথম অভিলাষ—জননীর পীযূষ পরিপূরিত পয়োধর। বাৎসল্য রসে পরিপ্লুতা জননীর পয়োধরযুগল অমিয় পীযূষধারায় পরিপূর্ণ বলিয়াই পীনোন্নত। তাই পীনোন্নত-পয়োধরারূপে তৃষ্ণাকাতর সন্তানের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণে মা চিরব্যাকুলা। এই অনুপম বাৎসল্য রসে পরিস্নাত সমগ্র সৃষ্টি অঙ্কুরিত হওয়ামাত্র সদ্যোজাত মানবশিশুর ন্যায় 'ওঁ মা' 'ওঁ মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠে—তাহা কোথাও স্ফুট, আবার কোথাও অস্ফুট ; কোথাও ব্যক্ত, আবার কোথাও বা অব্যক্ত।

লীলাময়ি! তোমার লীলা রহস্য উপলব্ধি করার শক্তি দাও মা।

শ্মশানবাসিনী—মৃত্যুর পর সকলের স্থিতিস্থানকে সাধারণতঃ শ্মশান বলা হয়। স্কন্দ পুরাণে আছে—

> **"শ্ম শব্দেন শবঃপ্রোক্ত শানং শয়নমুচ্যতে।**
> **নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনেঃ শব্দার্থকো বিদাঃ॥**
> **মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।**
> **শেরতেঽত্র শবং ভূত্বা শ্মশানন্তু ততো ভবেৎ॥"**

শ্ম শব্দে শব বা শরীর বুঝায়। মৃত্যুর পর জীবের দেহ যেস্থানে অগ্নিদগ্ধ বা মৃত্তিকাপ্রোথিত হইয়া বিলীন হয় সেই স্থানকে 'শ্মশান' বলে। প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে মহাভূত সকল যেখানে শবরূপে শায়িত হয়, সেই স্থান অর্থাৎ মহাশূন্যও শ্মশান। ব্রহ্মশক্তি হইতে

উদ্ভব ব্রহ্মাণ্ডের লীলাবসানে ব্রহ্মেই বিলয় সাধন হয়। তাই শ্মশানও ব্রহ্মপদবাচ্য। ক্ষিত্যাদিভূতপঞ্চক শবরূপে শায়িত বা লীন হয় পরব্রহ্মে। তাই ব্রহ্মসমাশ্রিতা ব্রহ্মশক্তি মা 'শ্মশানবাসিনী'।

সাধক কবি কাজি নজরুল ইসলামের একটি শ্যামা সঙ্গীতে এই তত্ত্বটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—"শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।"

মা প্রসবিনী, মা পালয়িত্রী, আবার অন্তিমে ঐ মা আপন কোলে আশ্রয় দিয়া থাকেন। সন্তানবৎসলা মার কি অপূর্ব লীলা!

জগতের মূল বা কারণ হিসাবে যোনিকে শ্মশান বলা হয়। মহাপ্রলয়ে সকল প্রাণী কালীতে লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে যোনিরূপা শব-শয্যা বা শ্মশান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন সাধক চিতা অর্থে চিৎশক্তিকে বুঝিয়া থাকেন। সেই হিসাবে চিদ্‌স্বরূপিণী কালীই প্রকৃত পক্ষে 'চিতা' বা 'শ্মশান'।

তন্ত্রমতে সুষুম্না নাড়ীই শ্মশান। কুণ্ডলিনী কালী মূলাধার চক্র হইতে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া সহস্রারে যাতায়াত করেন বলিয়া তাঁহাকে 'শ্মশানবাসিনী' বলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেবী শ্মশানবাসিনী সত্য, কিন্তু শ্মশান-কালী নহেন।

তন্ত্রে কালীকে বহ্নিরূপা বলা হইয়াছে। চিতা-বহ্নি জীবের স্থূলদেহ গ্রাস করে বলিয়া কালী 'বহ্নিরূপিণী'। আবার সাধকের অন্তরে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় বলিয়া জীবের অন্তরকেও শ্মশান বলা হয়। জ্ঞান-বহ্নিতে কামনা-বাসনায় আবৃত সাধকের সূক্ষ্ম দেহটি ভস্মীভূত হইলে অন্তর মলমুক্ত হয়। তখনই সাধক মুক্তিদাত্রী কালিকার অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিতে থাকেন।

"নদ নদী পারাবার প্রলয়ে সব একাকার
শ্যামাচরণে সব শবাকার।"

কর্ণভূষণ—দেবীর কর্ণভূষণ বালকের শব। ইহা হইতে বুঝা যায় যে নির্বিকার, নিষ্কাম, শিশু-ভাবাপন্ন সাধক দেবীর অতি প্রিয়।

পদ—দেবী কখন দক্ষিণপদ, কখন বা বামপদ, অগ্রে স্থাপন (আলীঢ়পাদা বা প্রত্যালীঢ়পাদা) করিয়া দণ্ডায়মানা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এক পদে অতীতকে এবং অন্যপদে ভবিষ্যৎকে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

কাঞ্চিধারণ—দেবীর কটিদেশে শবহস্ত নির্ম্মিত কাঞ্চি শোভা পাইতেছে। ইহার রহস্য এই যে হস্তেন্দ্রিয় কর্মের প্রতীক। কল্পাবসানে স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলে জীবগণ নিজ নিজ কর্মসহ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া সগুণ ব্রহ্মরূপিণী দেবীর কারণদেহে অবস্থান করে। মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণকে সেই দেবী হইতে কর্মানুসারে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য জীবগণের কর্মফলের প্রতীক শবহস্তনির্মিত কাঞ্চিটিকে মহাদেবী তদীয় উদরের নিম্নদেশ এবং প্রসবদ্বারের উর্ধ্বদিকের মধ্যবর্তী স্থানে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অন্যমতে, কটিদেশে শক্তি না থাকিলে কোন কঠিন কর্ম সম্পন্ন করা যায় না। একমাত্র হস্তের দ্বারাই সব কাজ সম্পাদিত হয়। তাই মা কটিদেশে শব হস্ত (কর) দ্বারা কাঞ্চিধারণ করিয়াছেন। এই দৃশ্য হইতে সকলেরই মনে হইবে যে নিয়ত-ক্রিয়াশীলা দেবীর কটিদেশ খুবই শক্ত এবং মজবুত।

ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র—দেবীর ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র তাঁহার মোক্ষ-প্রদানশক্তির পরিচায়ক। চন্দ্র হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়। মায়ের ললাটস্থ অমাকলা বা চন্দ্রকলা সাধারণ স্থূল চক্ষুর অগোচর। সেই কলা হইতে নিঃসৃত অমৃত সাধককে অমৃতত্ব বা মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।

শবরূপী-শিবের বক্ষোপরি দেবীর অবস্থান—তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতি একই মহাশক্তির দুই রূপ-গুণ। পুরুষভাব বন্ধনের হেতু এবং প্রকৃতি বা শক্তিভাব মুক্তির কারণ। তাই পুরুষভাবকে পদতলে স্থাপন করিয়া সাধককে সংসার বন্ধন হইতে রেহাই দেওয়াই মুক্তি-দাত্রীর অভিলাষ। আরও বলা যায় যে পুরুষভাবের মধ্যে কোন

তরঙ্গ না থাকায়, পুরুষ নিশ্চেষ্ট দ্রষ্টারূপে মায়ের চরণতলে অবস্থিত থাকিয়া অপূর্ব-লীলা-নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ।

একমতে, স্বয়ং মহাদেব মুক্তকেশীর চরণতলে শবরূপে অবস্থিত থাকিয়া জীবকুলকে দেখাইলেন যে মুমুক্ষু জীব মায়ের চরণতলে হৃদয় ঢালিয়া আপন অস্তিত্বকে বিলাইয়া দিলে মুক্তিদাত্রীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইবেন না। অন্যমতে, স্বয়ং মহাকাল যিনি সমগ্র বিশ্বকে কলন বা গ্রাস করেন, মহাকালী সেই মহাকালকে গ্রাস করিয়া থাকেন। এই রহস্যের রূপদান করা হইয়াছে মহাকাল শিবকে শবরূপে দেবীর পদতলে স্থাপন করিয়া।

কেহ কেহ বলেন যে পরব্রহ্ম স্বরূপিণী কালীর ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাব দুইটি একই সঙ্গে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে শবরূপী শিবের স্থান তাঁহার পদতলে স্থির করা হইয়াছে। ব্যক্ত অবস্থায় চৈতন্যের কণিকা লাভে প্রাণীকুল সজীব; আবার চৈতন্যহীন হইলে জীব ও জড়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। চৈতন্যহীন শবরূপী শিব মহাদেবীর সংহারলীলার পরিণতি—যাহা তাঁহার অব্যক্ত ভাবের প্রতীক।

আবার কেহ কেহ বলেন—বাহন হইবার যোগ্যতা মহাদেব ছাড়া অন্য কাহার আছে? এইজন্য সদাশিব মার পদতলে শায়িত।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির একটি নাম 'প্রধান'। তাই পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত সত্তার মধ্যে মাতৃভাব প্রধান। মাতৃভাবই ক্রিয়াত্মক এবং পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ। তাই কালীমূর্ত্তি শিবোপরি দণ্ডায়মানা। কালী-মূর্ত্তি ক্রিয়ার প্রতীক আর শিবমূর্ত্তি জ্ঞানময় বলিয়া নিষ্ক্রিয়। বস্তুতঃ উভয়ে অভিন্ন। সাধকের দৃষ্টিতে মায়ের এই রূপটি মধুর, বড়ই মধুর।

সাধক তন্ময় হইয়া গান ধরিলেন—

"মহেশ-হৃদি-সরোজে, শ্যামাচরণ-সরোজ রাজিল,
অধর-সরোজে মধুর হাসি, নয়ন-সরোজে করুণা রাশি,
শ্রীকর-সরোজে অভয় প্রকাশি, কিবা সরোজে সরোজ সাজিল।"

শিবা পরিবেষ্টিতা বা পরিবৃতা—শিবাদলের উচ্চরবের অর্থ মঙ্গলের জয় ঘোষণা। অপঞ্চীকৃত মহাভূত এবং শ্বেতবর্ণ অস্থিসমূহ মঙ্গল-সূচক বলিয়া 'শিবা' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে শ্মশানবাসিনী দক্ষিণা কালী 'শিবা পরিবৃতা'।

শিবাগণকে যামঘোষ বলা হয়। তাহারা প্রতিযামে মঙ্গলসূচক উদ্দীপনাময়ী উচ্চধ্বনি দ্বারা রাত্রিকালে তমোভূত সুষুপ্ত প্রাণীগণের চৈতন্য সম্পাদন করেন। এইজন্য দেবী 'শিবা পরিবেষ্টিতা'।

ঘোর রাবা—রাব শব্দের অর্থ নাদ। সৃষ্টির মূলে আছে এই চৈতন্য যুক্ত নাদ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শব্দসমষ্টি হইল মহাপ্রণব যাহা মহাদেবী হইতে উদ্ভূত।

ঘোর অন্ধকারে বা বিপদে শব্দ শুনিলে মনে যেন একটুখানি সাহস আসে—ইহাই মায়ের 'মা ভৈঃ' রবে অভয় বাণী ছাড়া আর কিছু নহে।

'ঘোর' নামক দানব সৃষ্টির কাজে বাধা স্বরূপ হওয়ায় শুধু ভয়ানক শব্দ দ্বারা বিনা প্রহারে দেবী তাহাকে বিনাশ করেন। তাই মা 'ঘোররাবা'।

মহারৌদ্রী—সূর্য্যকিরণকে রৌদ্র বলা হয়। ইহা প্রথমে পৃথিবীর জলকে বাষ্পাকারে মেঘে পরিণত করিয়া ধরণীতে জীবন সঞ্চারের জন্য বৃষ্টিরূপে ফিরাইয়া আনে। সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী দেবী অন্তিমে সন্তানকে ধারণ করিয়া রাখেন। তাই মা 'মহারৌদ্রী'।

দন্তুরাং—বিকশিত উন্নত দন্তই দন্তুর নামে অভিহিত। দেবী সব সময় কাল-চর্বণ নিরতা, ফলে মুখবিবর নিবদ্ধ নয়। তাঁহার প্রকটিত দন্তরাজি হাস্যভাবের পরিচায়ক। তাই মা 'দন্তুরা'।

কেশরাশি দক্ষিণমুখী লম্বমান—মায়ের কেশরাশি দক্ষিণ দিকে হেলিয়া থাকার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের দক্ষিণরূপী পুরুষভাগ নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়। ক্রিয়াশীলা বামাশক্তি যেন দক্ষিণকে কেশরাশি দ্বারা আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন।

বিপরীতরতাতুরা—মহাকাল-শিব রূপটি সগুণ ব্রহ্মের পুরুষরূপ, আর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্যে প্রবৃত্তা ভূমিকাই সগুণ ব্রহ্মের নারীরূপ। রতিক্রীড়ায় নারী যখন ক্রিয়াশীলা এবং পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কামশাস্ত্রে ইহাকে বিপরীত রতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই নির্গুণভাব উদাসীনতার পরিচায়ক এবং ক্রিয়াশীলভাব কর্ম-যজ্ঞে প্রবৃত্তা। শাস্ত্র ইহাকে সঙ্কেতে কামশাস্ত্রের ভাষায় বিপরীতরতাতুরা আখ্যা দিয়াছেন।

মহাকাল সংহার কার্য্যের পর মহাকালী নবীন সৃষ্টিতে প্রবৃত্তা। এক্ষেত্রে ধ্বংস ও সৃষ্টি পরস্পর অনুগামী বলিয়া বিপরীত রতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিপরীত রতির তাৎপর্য্য সাধারণের বোধগম্য বিষয়বস্তু নহে। ব্রহ্মতত্ত্বের গভীরতম প্রদেশের ব্যাপার। লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে না। কারণ, মনোরাজ্যের উর্ধ্বভূমিতে এই মহারহস্য নিহিত। একমাত্র ভাগ্যবান সাধক মায়ের কৃপায় এই গূঢ় রহস্যের আভাস লাভে ধন্য হইতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের সাধারণ আলোচনা পাঠকবর্গের কাছে উপস্থিত করিলাম।

গ্রাস করার অন্য অর্থ তাহাতে লীন হওয়া। শৈশবকাল কৈশোরে, কৈশোর যৌবনে এবং যৌবন বার্ধক্যে লীন হয়। বার্ধক্যের পরিণাম মৃত্যু। তারপর জননী জঠরে আবির্ভাব। এই দৃশ্য হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে একের বিলয়ে অপরের প্রকাশ। ইহা যেন বিপরীতরতাতুরা—মহাকাল এবং মহাকালীর স্বভাব-ধর্ম্মের মর্ত-লীলা।

ভক্তবৃন্দ এই অমৃত-রসে পরিস্নাত হইয়া সাধকের ভাষায় গাইতে পারেন—

"আর কাজ কি আমার কাশী,
কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

জয় মা, জয় গুরু।

শিবলিঙ্গ রহস্য

লিঙ্গ শব্দের আভিধানিক অর্থ এইরূপ :—

১। শিশ্ন, উপস্থ ; হেতু, কারণ ; শিবের মূর্ত্তি বিশেষ।

২। অনুমান, অর্থ প্রকাশক সামর্থ্য।

৩। স্ত্রী পুরুষাদি বুঝাইবার চিহ্ন।

লিঙ্গের মুখ্য অর্থ আলয়। ইন্দ্রিয়বিশেষকে যথার্থ লিঙ্গ বলা হয় না। সর্ব্বভূত যেখানে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই আলয়। যেমন সমুদ্র হইতে উদ্গত বুদ্‌বুদ্ জলের উপরে আসিয়া আবার সমুদ্রের জলেই মিশিয়া যায়, তেমনি শিব হইতে উদ্ভূত জীব সকল যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই লিঙ্গ নামে অভিহিত।

শাস্ত্রে আমাদের দেহের অবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা (১) স্থূল দেহ, (২) সূক্ষ্ম দেহ এবং (৩) কারণ দেহ। সূক্ষ্ম দেহের বর্ণনায় উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"**অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ**।" শিব মানুষের হৃদয়মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্থানে বিদ্যমান। এই কারণে তিনি লিঙ্গ নামে অভিহিত। শাস্ত্রে আবার পাই—

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
প্রলয়ে সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥"

আকাশ লিঙ্গ, পৃথিবী তাঁহার আসন। প্রলয়কালে দেবতা সকল লয়প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্তমান ছিলেন ; সেই কারণে লিঙ্গ শব্দে একমাত্র মহাদেবকে বুঝায়।

সূক্ষ্ম পুরুষ (ঈশ্বর) এবং সূক্ষ্মা প্রকৃতি (শক্তি) সাধারণ জীবের ধ্যান, ধারণা বা পূজার বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। তাই লিঙ্গময় ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত যোনিপীঠ সংস্থাপন করতঃ অধিকারভেদ পরিহারপূর্ব্বক পূজা, উপাসনা ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এই পূজাই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে হিন্দুর সবরকম দেব-দেবীর পূজায় অধিকারীর প্রশ্ন বিদ্যমান, কিন্তু শিবলিঙ্গের পূজায় পুরুষ-নারী-ভেদ-বিরহিত আপামর জনসাধারণ সকলেরই সমান অধিকার। ইহাতে নিহিত আছে এক

অতি উচ্চস্তরের সুমহান্ সার্ব্বভৌম ভাব। পূজার বিধান অন্যান্য দেব-দেবীর পূজার বিধানের সঙ্গে তুলনা করিলে সহজতম বলা যায়। **'নমঃ শিবায়'** মন্ত্রে পূজার বিধান। এই সঙ্গে সজল বিল্বপত্র ব্যবহার করিলে খুবই ভাল। শিবের প্রীতি সম্পাদন করা যায় অতি শীঘ্র; তাই তিনি 'আশুতোষ' নাম ধারণ করিয়াছেন।

"চিন্ময়স্য অদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, অশরীরী, মায়াতীত পরব্রহ্ম হইলেও উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ তাঁহার রূপ-কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ কল্পনা ব্রহ্ম নিজেই করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে "বৃহৎ শিব পুরাণ" গ্রন্থের অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরে সনতকুমার বলেন ঃ—

"এত শুনি ব্রহ্মসুত কহে ধীরে ধীরে।
শুন শুন ঋষিগণ কহিব সবারে॥
প্রকৃত-রূপিণী দেবী নগেন্দ্রনন্দিনী।
পরম পুরুষ হন দেব শূলপাণি॥
এ দোঁহা হইতে হয় জগত সৃজন।
সৃষ্টি কর্ত্তা নাহি জান অন্য কোন জন॥
যতেক পুরুষ আছে সংসার মাঝারে।
শিবাত্মক সবে হয় জানিবে অন্তরে॥
জগতে যতেক নারী কর দরশন।
পার্ব্বতীরূপিণী সবে ওহে ঋষিগণ॥
পুংলিঙ্গরূপক হন দেব মহেশ্বর॥
স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী দেবী তাপস-নিকর॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব স্থাবরজঙ্গম।
শিব-দেবী-লিঙ্গরূপী ওহে ঋষিগণ॥
অখিল জগত এই শিববংশ হয়।
শিবাত্মক সর্ব্ব বিশ্ব নাহিক সংশয়॥"

এই সম্বন্ধে পৌরাণিক রহস্যাদি উচ্চমানের সাধকের কাছে স্বপ্রকাশের ন্যায় প্রতিভাত হইবে।

অতি প্রাচীনকালে জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়াই থাকিত। এইজন্য সকলের খুব বেশী নজর ছিল জনবলের দিকে। সেই সময় পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে সৃষ্টি-তত্ত্বের দেবতা বা প্রজনন-দেবতা হিসাবে লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। আর্য্যরা প্রথমদিকে সৃষ্টি-দেবতা হিসাবে ঊষাকালীন সবিতার পূজা করিতেন। বৈদিক যুগের পর আর্য্যরাও লিঙ্গপূজা গ্রহণ করেন। তাঁহারা অবশ্য লিঙ্গ প্রতীকে সূক্ষ্মদেহ স্থাপন ক্রমে বিশ্বস্রষ্টার আরাধনা করিতে লাগিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের তেজঃপ্রভা অতি দীপ্ত ও প্রখর থাকায় তাঁহার দিকে তাকানো মানবচক্ষুর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া জ্যোতির্লিঙ্গের মাধ্যমে শিবের আরাধনার প্রবর্ত্তন হইল। তারপর নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জৈনোত্তর ও বুদ্ধোত্তর যুগে প্রাচীন লিঙ্গপূজার চিন্তাধারা (জনবল-বৃদ্ধি) সমূলে বিনষ্ট হইয়া মহান্ জ্যোতির্লিঙ্গের আরাধনা প্রচলিত হয়। অবশেষে আদি শঙ্করাচার্য্যের নেতৃত্বে ইহার পুষ্টি সাধন ঘটে। যার ফলে, লিঙ্গপূজা দিগ্‌দিগন্তে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

সদাশিব

উন্নততর জীবন যাপনের সঙ্কল্পকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে ইতিহাসের শিক্ষাকে কাজে লাগাইতে হইবে। তাহাকে বর্ত্তমানের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া বর্ত্তমানকে ফুলে, ফলে সুশোভিত করিতে হইবে। আবার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ভিত্তি হইবে অতীত ও বর্ত্তমানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাধারা।

শিব তথা সদাশিব সম্পর্কে আলোচনাকালে উপরে উল্লিখিত কথাগুলি সব সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আমাদের

কৃষ্টি এবং সভ্যতা সদাশিবের বিরাট অবদানে পরিপুষ্ট। তিনি ছিলেন আমাদের মত একজন মানুষ। তাঁহার জন্ম তিব্বতে, কিন্তু লীলাক্ষেত্র ভারতভূমি। তাঁহার আবির্ভাব প্রাগৈতিহাসিক যুগে তিনি অনার্য্য সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া আর্য্যরা প্রথমদিকে তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নাই; যদিও এই তিব্বতবাসী নরদেহধারী বিশ্বাত্মা, মহাজ্ঞানী ও মহাবিভূতির অধিকারী ছিলেন। তিনি যোগের সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়া আর্য্য অনার্য্য সকলকে বিমোহিত করেন। এই যোগপন্থা **'সহজ মার্গ'** বলিয়া পরিচিত। শিব ছিলেন অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী, তাই বাহ্য দৈহিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত। সবসময় ব্রহ্মানন্দে বিভোর, তাই তাঁহার নেত্রযুগল অর্দ্ধনিমীলিত; বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে নেশাখোর বলিয়া মনে হইত। আর্য্যেরা শিবের যোগবিভূতি এবং নানাবিধ জনকল্যাণমূলক আবিষ্কারে এতই আকৃষ্ট হইলেন যে অবশেষে তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব আখ্যায় ভূষিত করিলেন।

বৈদিক যুগের আর্য্যেরা রুদ্রের উপাসক ছিলেন। রুদ্র প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপের প্রতীক। বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির এই ধ্বংসাত্মক শক্তির মধ্যেই বীজাকারে সৃজন ও পালন করিবার শক্তির সন্ধান পাইলেন। ইহা হইতে সূর্য্য কিরণের মধ্যে তিনরূপ বা ত্রিমূর্ত্তি কল্পনার সূত্র আবিষ্কার করা যায়। খুব সম্ভব আর্য্যেরা রুদ্রের মধ্যে 'শিবম্-সত্যং-সুন্দরম্' এর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

"বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম, বৃংহত্বাদ্ ব্রহ্ম।"

যিনি বৃহৎ, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়; আবার যিনি অন্যকে বৃহৎ করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখেন তাঁহাকেও ব্রহ্ম বলা হয়।

যিনি যথার্থই বড়, তিনি সব সময় অন্যের বিকাশের পথের সহায়ক হইয়া থাকেন; কোন অবস্থায় কাহারও ধ্বংস বা অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এইরূপ চিন্তাও তাঁহার মনে স্থান পায় না।

শিবের জীবন-ধারাই একটি দর্শন। ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-দর্শন যখন অভিন্ন, তখন ইহাদের মিলিত সত্ত্বার আবির্ভাব হয় দেবতারূপে। একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, যাহা এক মহাকেন্দ্র হইতে উৎসারিত, তাহাই এক দেবতারূপে প্রকাশিত। সেই হিসাবে শিব শুধু দেবতা নন, বহুদেবতার সমষ্টি। তাই তিনি মহাদেব।

যেমন নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর মত বহু গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রথমে অবতার এবং ক্রমে বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হইয়াছিলেন, তেমনি মহাযোগী মানুষ শিব ধীরে ধীরে মহেশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া গেলেন।

বৈদিক যুগে দেব-দেবী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিমা গড়িয়া পূজার প্রচলন ছিল না। যাগ-যজ্ঞাদির মাধ্যমে তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করা হইত। তখন ধারণা ছিল "**ঈশ্বরস্য প্রতিমা নাস্তি**।"

দৈবী শক্তির সঙ্গে দুইটি জিনিস জড়িত। প্রথমটি প্রজ্ঞাতত্ত্ব, যাহাকে 'চিতি' বলা যায়। দ্বিতীয়টি শক্তিতত্ত্ব, যাহাকে বলা যায় 'কালশক্তি'। ইহা কালচক্রের মধ্য দিয়া চলে।

শিব অতি নিকটের বলিয়া তাঁহার পূজায় পৃথক বীজমন্ত্র নাই। বেদানুগামীরা তাঁহার বীজের সঙ্গে হসন্তযুক্ত 'ম' (ম্) ব্যবহার করিতেন। জৈন, বৌদ্ধ এবং শৈব তন্ত্রে শিবের বীজমন্ত্র হইল 'ঐং'। আবার পৌরাণিক যুগে শিবচেতনায় নূতন বীজ 'হ্রৌং' প্রবর্ত্তিত হইল।

জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ চলার সময় পাশে পাশে শৈব-তন্ত্র চলিতেছিল। জৈন প্রভাবে শিবোত্তর তন্ত্রে শিবলিঙ্গের পূজা প্রবর্ত্তিত হয় প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে। সেই সময় শিবের প্রভাব এত বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার স্থলে অন্য মতবাদ প্রতিষ্ঠা করান প্রায় অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধ তন্ত্রে শিবোত্তর তন্ত্রের শিব স্বীকৃত হইলেন। তখন শিবের বিরাট জনপ্রিয়তার জন্য শিবকে বাদ দিয়া কিছু করা সম্ভব ছিল না। তৎপর পৌরাণিক যুগে বহুরকম শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বিবর্ত্তিত হওয়ার পর 'নাথ' ধর্ম্মের যুগ। 'নাথ' ধর্ম্মে গুরুদেবের নামের সঙ্গে

'নাথ' শব্দ যোজনা করা হইত। সব নাথ-যোগীদের আরাধ্য দেবতা শিব। এই ভাবে শিব সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করিলেন।

জৈন ও বৌদ্ধযুগে শিবোত্তর তন্ত্র প্রচলিত হয়। মূর্ত্তি পূজার প্রচলনও ঐ সময় হইতে আরম্ভ হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেবের তিরোধানের তিন শত বৎসরের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়—(১) মন্ত্রযান ও (২) তন্ত্রযান। ইহারা বহু দেবী-দেবতার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। শিবের অলোকসামান্য প্রজ্ঞা, কর্ম্মৈষণা ও কর্ম্মনৈপুণ্য এবং তদুপরি আদর্শগত জীবন একত্রিত হওয়ার ফলে শিবের উপর সর্ব্বস্তরের মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা আসে। তাই তিনি দেবতা। যান্ত্রিক নিয়মে অর্থাৎ জ্ঞান বর্জ্জিত কর্ম্ম করাকে শিব পছন্দ করিতেন না। কারণ যন্ত্রকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

'শিব মানুষের শরীরে আবির্ভূত বটে, কিন্তু মানুষ নন'। 'শিব-শক্তি' বা 'অর্দ্ধনারীশ্বর শিব' বা 'শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম' ইত্যাদি ভাবনা শিবের আবির্ভাবের কয়েক হাজার বৎসর পরে প্রচারিত হইয়াছে।

শিব শব্দের মুখ্য অর্থ তিনটি করা যাইতে পারে।

(১) **কল্যাণ** বা **মঙ্গল**—আশীর্ব্বাদ করার সময় বলা হইয়া থাকে—শিবমস্তু বা কল্যাণমস্তু।

(২) চিতি শক্তি।

(৩) সদাশিব বা মানুষশিব। তিনি জীবের অর্থাৎ মানুষ, পশুপক্ষী এমন কি উদ্ভিদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য, এক কথায় জগতের হিতের নিমিত্ত, নিজের সব কিছু বিলাইয়া দিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। এমন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দ্বিতীয়জন পুরুষের আবির্ভাব এই পৃথিবীতে আর হয় নাই।

শিবের বহুমুখী বিরাট অবদানের মূল্যায়ন খুবই প্রয়োজন। যেহেতু তাঁহার আবির্ভাব প্রাগৈতাহাসিক যুগে, প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে গবেষণা হইবে সুকঠিন। তথাপি উপযুক্ত গবেষকবৃন্দের প্রয়াস অব্যাহত রাখিতে হইবে।

শিবের তিন স্ত্রী ছিলেন—

(১) আর্য্যকন্যা গৌরবর্ণা পার্ব্বতী।

(২) অনার্য্যকন্যা কৃষ্ণ বা মেঘবর্ণা কালী।

(৩) মঙ্গোলিয়কন্যা পীতবর্ণা গঙ্গা।

[উল্লিখিত তিনজনই আমাদের পূজার বিষয়ীভূতা দেবী নহেন।]

ভারতে তখন তিনটি বৃহৎ সম্প্রদায়—(১) আর্য্য, (২) অনার্য্য ও (৩) মঙ্গোলীয় বাস করিত তাহাদের মধ্যে সব সময় কলহ বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের অবসানকল্পে তিন সম্প্রদায় হইতে তিন কন্যা শিব বিবাহ করেন।

শিবের সবচেয়ে বড় অবদান আপামর জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মবোধের বীজ রোপণ, যাহা পরবর্ত্তীকালে শৈবধর্ম্ম নামে অভিহিত। শিব নিয়ম-প্রণালী তৈয়ার করিয়া বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন; যার ফলে সমাজদেহে শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়া উঠিল। পরবর্ত্তীকালে ইহা শৈব বিবাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিবের আগে তন্ত্র নানাভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। শিব বহুধাবিক্ষিপ্ত তন্ত্রকে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্ত্র মানুষকে একদিকে চরম সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হইবার পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যদিকে ব্যবহারিক জগৎকে উপেক্ষা না করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষার পরামর্শ দিয়াছেন; মানুষ যাহাতে মনের ভিতরে, আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারই নির্দ্দেশ দিয়াছেন; 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' বাক্যে যেমন সামনের দিকে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দিয়াছেন, তেমনি বাহিরের জগতে কি ঘটিতেছে তাহা উপেক্ষা না করার পরামর্শ দিয়াছেন। এই ধর্ম্মে কাহাকেও উপেক্ষা করা হয় নাই। কি আর্য্য, কি অনার্য্য, কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা শূদ্র, পুরুষ, নারী—সকলেই এই ধর্ম্মে সমমর্য্যাদার অধিকারী। শিবের এই সার্ব্বভৌমভাবের প্রতি সুধী পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাচীনকালে মাতৃশাসিত সমাজব্যবস্থা ছিল। তৎপর এক একজন ঋষি এক এক পাহাড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের নিজ নিজ অনুগামীরা সেই সেই পাহাড়ে বাস করিতে শুরু করেন। এক পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠী-পিতা হইতেন সেই পাহাড়ে বাসকারী ঋষি। তাঁহার নামেই গোত্র প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই পাহাড়ের বাসিন্দারা সেই ঋষিকে গোত্র-পিতা বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন। এক পাহাড়ের বাসিন্দাদের সহিত অন্য পাহাড়ের বাসিন্দাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিত। শিবের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শিবানুগামী হন। সকল পাহাড়ের অধিবাসীরা সমভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক হইয়া যাওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

শিব সাতটি জন্তুর ধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়া সুরসপ্তক সৃষ্টি করিলেন। যাহার ফলে ছন্দ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল।

শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল স্বরোদয় শাস্ত্র শিব আবিষ্কার করেন। তারপর শিব আবিষ্কার করেন মুদ্রা যাহা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ছন্দের সঙ্গে মুদ্রা সংযোজিত করিয়া নৃত্যের প্রবর্ত্তন করিলেন এবং তারপর বাদ্যের সঙ্গে ছন্দ এবং মুদ্রাকে সংযোজিত করিয়া দিলেন। বাদ্য তখন ছন্দ এবং মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া নৃত্যের তালে তালে বাজিতে থাকিল। শিব তাণ্ডব নৃত্য প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষের চিন্তা করা এবং মনে রাখার শক্তিকে বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আদর্শে শিব ছিলেন অতি কঠোর, কিন্তু ব্যবহারে 'মৃদুনি কুসুমাদপি'।

দেহরক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রাণীর কোন না কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। পশুদের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাহাদিগকে কখন জিহ্বার সাহায্যে আবার কখনও বা গাছে গা ঘষিয়া রোগ সারাতে দেখা যায়। শিব মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধের বিধিবদ্ধ রূপ দিলেন।

শিবের মতবাদ এবং তাঁহার আচরিত জীবনধারা চরম বৈরাগ্যের ইঙ্গিতবাহক। সিন্ধু সভ্যতার যুগে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি বড় বড় লোকালয়ের নগর দেবতা ছিলেন পশুপতি।

নরদেহধারীর উপর ভগবত্তা আরোপ করিতে বদ্ধ জীবের সংশয় উপস্থিত হয়। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

পদ্যানুবাদ—

"সর্ব্বোপরি স্থিত আমি ভূত মহেশ্বর।
'মানুষ' ভাবি অবহেলা করে অজ্ঞ নর॥"

এই মানুষ 'শিব' শিবোত্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত কয়েক হাজার বৎসরে নানা বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্য দিয়া স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া, উদ্ভিদাদিসহ সমগ্র প্রাণীজগতের ত্রাণকর্ত্তা শিব দেবতা, দেবতার দেবতা, অবশেষে অশরীরী জ্যোতির্লিঙ্গ পরমাত্মাস্বরূপে জীবের কাছে ধরা দিলেন।

"ব্রহ্মা বিষ্ণু সাহঙ্কারৌ ঊর্দ্ধমধোযাতৌ—হর ঊর্দ্ধমধো যাতৌ।
ঐশ্বর্য্যং তদ্গন্তুং ঐশ্চর্য্যং তদগন্তুং শীঘ্রং তে শম্ভো॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং পারং নায়াতৌ—হর পারং নায়াতৌ।
ভ্রান্তা নিরহঙ্কারৌ ভ্রান্তা নিরহঙ্কারৌ শরণং তে যাতৌ॥"

"হে শম্ভো! অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তোমার ঐশ্বর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য ব্রহ্মা ঊর্দ্ধে ও বিষ্ণু অধোদিকে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু দিব্য সহস্র বর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াও তোমার ঐশ্বর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছাইতে না পারিয়া অহঙ্কার রহিত হইয়া, অবশেষে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

ওঁ হর হর হর মহাদেব।

শিবের ধ্যান

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

অনুবাদ

"যিনি রজতগিরি সদৃশ, যিনি সুন্দর চন্দ্রকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার দেহ রত্নালঙ্কারের দ্বারা উজ্জ্বল, যিনি চারি হস্তে কুঠার, মৃগ, বর ও অভয় ধারণ করেন, যিনি প্রসন্ন ও পদ্মাসীন, যাঁহাকে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে স্তব করিয়া থাকেন, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত, বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ, নিখিল ভয়ের হরণকারী, পঞ্চ-বদন ও ত্রিনেত্র, সেই মহেশকে নিত্য ধ্যান করিবে।"

শিবের ধ্যানের সংক্ষিপ্ত অর্থ / ব্যাখ্যা

মহেশং—মহেশ শব্দে পরমেশ্বর বা শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকারীকে বোঝায়।

রজতগিরিনিভং—রৈবতক পর্ব্বত যেমন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যতেজে তুষার শুভ্র অবস্থায় আলোকজ্জ্বল, শুভ্র-তনু শিবও তেমনি রূপালি রং-এর পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তিময়।

চারুচন্দ্রাবতংসং—চাঁদের সামান্য তির্যক অবস্থানহেতু তাহার ষোড়শ বা অমাকলা আমরা দেখতে পাই না। এইজন্য সেই যুগের অনেকে ভাবিতেন যে উহা শিবের মস্তকোপরি রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধারস পান করিয়া শিব বহির্দৃষ্টিতে নেশাখোর এবং অন্তর্দৃষ্টিতে মন-মাতাল অবস্থায় ভোলানাথ হইয়াছেন। মহাযোগেশ্বর অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র শিবকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেশাখোর মনে হওয়া বদ্ধ জীবের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।



শিব

অন্যমতে চন্দ্রকলার ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—গুপ্ত রাজত্বকালে পঞ্চনদের তীরে একরকম ওষধি পাওয়া যাইত, যাহার লতায় পর পর পনেরটি পাতা হইত। পরে পাতাগুলি এক এক করিয়া ঝরিয়া পড়িত এবং সঙ্গে সঙ্গে ওষধিটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। এই ওষধি সেবনে বহু ব্যাধি নিবারণ এবং মানবদেহে চন্দ্রকলার মত পুষ্টিসাধন হইত। সোমের নব শক্তির কল্পনা চন্দ্রের শান্ত, স্নিগ্ধ কিরণজাল হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

(ক) "সোম নামঃ ওষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ।
স সোম ইব হীয়তে বর্ধতে চ॥"

(খ) "রাকা, কুমুদ্বতী, নন্দা, সুধা, সঞ্জীবনী, ক্ষমা,
আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা, হ্লাদিনী নব-শক্তয়।"

—চরক সংহিতা

পরবর্তীকালে অনধিকারী তান্ত্রিকেরা শিব-সাধনার সঙ্গে কদর্থ করিয়া মদ্যপানের মাধ্যমে উল্লিখিত নবশক্তি উজ্জীবনের চেষ্টা করিয়াছেন।

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং—অত্যুজ্জ্বল রত্নাদি হইতে উদ্ভূত তেজ বা জ্যোতির ন্যায় শিবের দেহখানি আলোকময় বা দীপ্তিময়।

পরশু-মৃগ-বরাভীতি হস্তং—অত্যাচারীকে দমন করার উদ্দেশ্যে শিবের হাতে রহিয়াছে পরশু বা টাঙ্গি। শিব উদ্ভিদ, পশুপক্ষী এবং মানুষ সকলকে সন্তানবৎ প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়া লালন করিতেন। তাই মৃগসহ যাবতীয় পশু নির্ভয়ে শিবের কাছে বিচরণ করিত। শিব আর্ত্ত জীবের ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সবাইকে অ-ভীতি বরদানে কৃতার্থ করিতেন। এই বরদানের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে দুষ্ট প্রাণীরা পর্য্যন্ত এই অ-ভীতি বরলাভে বঞ্চিত হইত না। তবে সংশোধনের উপায় ঠিক করিয়া দিতেন। এইজন্য নির্দ্বিধায় শিবকে প্রেমিকপ্রবর বলা যায়।

প্রসন্নম্—সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় মানসিক স্থৈর্য্য ও সাম্য শিব হাসিমুখে বজায় রাখিতে সমর্থ ছিলেন।

পদ্মাসীনং—শিব সবসময় উপবেশনকালে পদ্মাসনে থাকিতেন। যোগ-সাধনায় পদ্মাসনের মূল্য এবং মর্য্যাদা অপরিসীম। প্রস্ফুটিত পদ্মের মূল ও মৃণাল যথাক্রমে পঙ্ক ও জলের মধ্যে থাকে; উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে—পাতা ও ফুল। পদ্ম কর্দ্দমের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে যোগসূত্র অব্যাহত রাখে। যোগসাধনার কালে সাধক পদ্মাসনে বসিয়া নিজেকে জড় জগতের ঊর্দ্ধে ভাসাইয়া রাখিতে সমর্থ। শিব পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় জড়-জগতের যাবতীয় কালিমাকে পদদলিত করিয়া নিজেকে সবসময় আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যুক্ত রাখিতেন।

স্তুতমমরগণৈঃ—অমর দেবগণ শিবকে মহাদেব আখ্যা দিয়াছেন। অতএব দেবতারা শিবের স্তুতি করিবেন—ইহা সহজে অনুমেয়।

ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানং—পশুচর্ম্মকে 'কৃত্তি' বলা হয়। শিব ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিতেন বলিয়া তিনি 'কৃত্তিবাস' নামে খ্যাত। ব্যাঘ্র চর্ম্ম তাঁহার আসন ছিল। তাই শিব ব্যাঘ্রাসীন ও ব্যাঘ্রাম্বর।

বিশ্বাদ্যং—চিদ্‌ঘনসত্তা পরমপুরুষ শিব এবং আমাদের মধ্যে বা অতি নিকটে পাওয়া মানুষ শিবে তফাৎ কোথায়? আদি স্রষ্টার ভূমিকা যখন নরদেহধারী শিবের মধ্যে বিদ্যমান, তখন শিবকে আদি পিতার মর্য্যাদা দিলে অন্যায় কোথায়?

বিশ্ববীজং—সৃষ্টির আদি বীজ আদি পুরুষে বা শিবে নিহিত। পরে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

নিখিলভয়হরং—'নাই খিল যার' অর্থাৎ যাহা অর্গলবদ্ধ নহে, যাহা কোন বাধায় আবদ্ধ নহে, তাহাকে 'নিখিল' বা 'অখিল' বলা হয়। পশুর যেমন ভয় আছে, মানুষেরও নানাপ্রকার ভয় আছে। শিব বহুমুখী ভয় দূর করার জন্য নানাবিধ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যেমন, মানুষের রোগ নিবারণের জন্য বিক্ষিপ্ত প্রতিবিধানগুলিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া নূতন রূপদান, শত্রুভয় দূর করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রবর্ত্তন, আধ্যাত্মিক ভয় দূর করার নিমিত্ত তন্ত্রযোগের প্রবর্ত্তন,

পশুকুল ও উদ্ভিদ্ রক্ষার জন্য মানুষকে শিক্ষাদান ইত্যাদি। তাই শিবকে 'নিখিলভয়হরম্' বলা হইয়াছে।

পঞ্চবক্ত্রম্—শিবের পাঁচটি মুখ ছিল বলিয়া তাঁহাকে পঞ্চানন বলা হয়। জড় পাঞ্চভৌতিক দেহে স্থূল পাঁচটি মুখের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? একই মুখ হইতে একই বিষয়বস্তু সম্পর্কে অন্তর্নিহিত মূল ভাবধারাকে পরিবর্তন না করিয়া পাঁচ প্রকার অভিব্যক্তি সম্ভব। পাঁচটি মুখের নাম—(ক) কল্যাণসুন্দরম্, (খ) দক্ষিণেশ্বর, (গ) ঈশান, (ঘ) বামদেব এবং (ঙ) কালাগ্নি।

শিবের আসল মুখ 'কল্যাণসুন্দরের' ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে কঠোরতাবর্জ্জিত এবং সংশোধনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণক্রমে এই মুখে তিনি শিক্ষা দেন। অন্যান্য মুখের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আসল উদ্দেশ্য কল্যাণসাধন।

অন্যমতে, শিব চারিমুখে চারিবেদ এবং পঞ্চম মুখে তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'পঞ্চানন' নামে অভিহিত।

শিবের চারিদিকে চারিবেদ এবং অধোমুখে তন্ত্র উচ্চারিত হয়। ইহার আভাস আছে অথর্ব্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে, ব্রাত্য সূক্তে।

ত্রিনেত্রম্—মানুষের স্থূল দুই চক্ষু পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয়। এই স্থূল নেত্র যুগলের সাহায্যে আমাদের জাগতিক দেখাশুনার কাজ সম্পন্ন হয়। আবার বহুদূরের কিছু দেখিতে হইলে দূরবীণের সাহায্য নিতে হয়। আবার আড়ালে অবস্থিত কোন বস্তু স্থূল চক্ষুর দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। একমাত্র তৃতীয় নেত্র, যাহা জ্ঞানচক্ষু নামে পরিচিত, প্রস্ফুটিত হইলে সবকিছু গোচরে আসে। এমন কি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালের সবকিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা মনুষ্যদেহের কূটস্থে অবস্থিত। মহাযোগী শিব ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। তাই ধ্যান মন্ত্রে শিব 'ত্রিনেত্রম্'।

পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রম্

আদি কাদি কিল থাদি তারকং, বর্ণমণ্ডলমখণ্ড সিদ্ধিদম্।
অন্তরুল্লসিত হক্ষলাক্ষরং, লক্ষয়ন্তি পশবঃ কথং শিবে॥ ১
ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণং সরসীরুহং ভজে॥ ২
তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে ক্লৃপ্তরেখমকথাদিরেখয়া।
কোণ লক্ষিত হ-ল-ক্ষ-মণ্ডলীভাবলক্ষ্যমবলালয়ং ভজে॥ ৩
তৎপুটে পটুতড়িৎকড়ারিম স্পর্দ্ধমানমণি পাটল প্রভম্।
চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্নাদ-বিন্দু-মণিপীঠমণ্ডলম্॥ ৪
ঊর্দ্ধমস্য হুতভুক্‌শিখাত্রয়ং তদ্বিলাসপরিবৃংহণাস্পদম্।
বিশ্বঘস্মরমহোচ্চিদোৎকটং ব্যামৃশামি যুগমাদিহংসয়োঃ॥ ৫
তত্র নাথচরণারবিন্দোয়ঃ কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদম্॥ ৬
নিষক্তমণিপাদুকানিয়মিতাঘ কোলাহলং
স্ফুরৎ কিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্।
পরামৃত সরোবরোদিত সরোজ সদ্রোচিষং
স্মরামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ম্॥ ৭
পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাৎ বিনির্গতম্।
ষড়াম্নায়ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতিদুর্লভম্॥ ৮

সংক্ষিপ্ত অর্থ / অনুবাদ

১। 'অ' হইতে 'অঃ' পর্য্যন্ত, 'ক' হইতে 'ত' পর্য্যন্ত এবং 'থ' হইতে 'স' পর্য্যন্ত অসীম সিদ্ধিপ্রদ বর্ণসমূহ, এবং ত্রিকোণের প্রতি কোণে যথাক্রমে 'হ' 'ল' এবং 'ক্ষ' অক্ষরযুক্ত যে ত্রিগুণাত্মক কমলদল, তাহা সাধারণ জীব কিভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়, দেবি! তাহা শ্রবণ কর।

২। মূলাধার হইতে শিরস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত কুণ্ডলিনী শক্তির যাতায়াতের জন্য ব্রহ্মনাড়ীর অভ্যন্তরে যে ছিদ্রপথ আছে, তাহাকে মণ্ডিত করিয়া সহস্রদল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে; তাহার উদরে বা কর্ণিকাতে নিত্য সংলগ্ন অতি বিচিত্র শ্বেতবর্ণ যে দ্বাদশদল কমল আছে এবং যাহার প্রতিদলে শ্রীগুরু পাদুকারূপ একটি করিয়া মন্ত্রাক্ষর (হ-স-খ-ফ্রেং হ-স-ক্ষ-ম-ল-ব-র-য়ুং) উন্মনীভাবে সর্বমোট দ্বাদশটি (১২) আছে, আমি সেই কমলকে ভজনা বা পূজা করি।

দ্বাদশদলের মন্ত্রাক্ষরগুলি উর্দ্ধমুখে মহাকাশকে তীব্র শ্বেত জ্যোতিঃ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছে। দ্বাদশদল পদ্ম উর্দ্ধমুখে ফুটিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রদল কমল, যাহা এতক্ষণ নানাবর্ণে-উর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত ছিল, তাহা এখন অধোমুখে ছত্রাকার হইয়াছে।

৩। এই দ্বাদশদলের কন্দলিত বা পরস্পর সংলগ্ন কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণের প্রতি ভুজে ষোড়শবর্ণযুক্ত অ-ক-থাদি চিহ্নিত (অর্থাৎ 'অ' হইতে 'অঃ' পর্য্যন্ত, 'ক' হইতে 'ত' পর্য্যন্ত এবং 'থ' হইতে স পর্য্যন্ত) এবং কোণত্রয়ে যথাক্রমে হ-ল-ক্ষ যুক্ত যোনি-পীঠ সদৃশ ত্রিকোণমণ্ডলকে আমি ভজনা বা পূজা করি।

'কন্দলিত' শব্দ দ্বারা এখানে অকথাদি রেখার উন্মনী এবং সমনী ভাবের ত্রিকোণদ্বয়ের অবস্থান বোধগম্য হইতেছে। এই ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে শ্রীগুরুর চতুষ্কোণ আসন। উন্মনীভাবে পরমপুরুষ অগ্রে থাকিয়া পরমা প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়া পরব্রহ্মমুখী হইয়াছেন। আবার সমনীভাবে পরমা প্রকৃতি অগ্রে থাকিয়া পরম পুরুষকে তাঁহার আনন্দ লীলার সাথী করিয়া বিশ্বসৃষ্টি মানসে অগ্রসর হইয়াছেন। (সমনী-ভাবের দ্বাদশ মন্ত্রাক্ষর স-হ-খ-ফ্রেং স-হ-ক্ষ-ম-ল-ব-র-য়ীং)

৪। তাহার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতের মত অতিশয় দীপ্তিশালী অগ্নিবর্ণ সদৃশ গোলাপী বর্ণের মণির মত প্রভাসম্পন্ন চতুষ্কোণ আসন বা সিংহাসন উপরি শ্রীগুরুর চিন্ময় দেহ, তাঁহার নাদ, বিন্দু, মণি বা বীজ-পীঠের মণ্ডলের সহিত ব্রহ্মরন্ধ্রের হৃদয়ে বা কেন্দ্রে ভজনা করি।

৫। এই মণিপীঠ মণ্ডলের উপর দিকে তিনটি অগ্নিশিখা সদৃশ বিরাট প্রলয়াত্মক মহাদীপ্তিশালী জ্যোতিঃ যাহা সৃষ্টির বিনাশ এবং বিশ্বসংহারে সমর্থ; এবং তাহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত চিতের উৎকট ঘনীভূত ভাব অথচ ইহাই পরিবর্দ্ধিত বিলাসভূমি; আমি পরস্পর সংলগ্ন দেহ সেই যুগল আদি হংসকে ভজনা করি।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তন্ত্রের শেষ দুই তত্ত্ব অর্থাৎ ৩৫ এবং ৩৬ সংখ্যক তত্ত্ব, যাহা শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব বলিয়া কথিত, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার চমৎকার রূপদান করা হইয়াছে।

"মূলাধারে বসেচ্ছক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।
তয়োরৈক্যং মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে॥"

৬। সেইখানে আদি 'হং'—'সঃ' যুগলের চরণকমল স্থাপিত, যাহা হইতে কুঙ্কুম অরুণাভ সুধার মকরন্দপ্রবাহ ঝরিতেছে। শ্রীনাথের দুখানি চরণকমল অতীব স্নিগ্ধ এবং সুশীতল চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনে হইতেছে। আমি সেই মঙ্গলাস্পদ শ্রীচরণকমল মনে মনে ধ্যান করি।

৭। এই সুধাসিক্ত মণিময় পাদুকাপীঠ সকল পাপ এবং কোলাহল দূর করে। চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত অরুণিত নবপল্লবের ন্যায় নখরাজি এবং পাদুকাখানি যেন পরামৃত আনন্দ-সরোবর হইতে উদিত অতি নির্ম্মল প্রভাযুক্ত কমল সদৃশ শিরস্থিত শ্রীগুরুর চরণযুগল আমি ভজনা বা পূজা করি।

৮। উক্ত পঞ্চশ্লোক সমন্বিত পাদুকাপঞ্চকস্তোত্র সদাশিবের পঞ্চমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিলে ছয়টি আম্নায় বা জ্ঞানরূপ ফল পাওয়া যায়। পঞ্চভূতময় বিশ্বে ইহা সুদুর্লভ।

উপসংহারে এই শ্লোকে "পঞ্চ পাদুকা" স্তোত্রের রচয়িতা যে স্বয়ং পঞ্চেশ্বর সদাশিব তাহাই বলা হইয়াছে। ষড়াম্নায় এইরূপ—

(ক) পূর্ব্বদিকে—তৎপুরুষ বা ঈশ্বর।

(খ) দক্ষিণ দিকে—অঘোর বা রুদ্র।

(গ) পশ্চিম বা বামদিকে—বামদেব বা বিষ্ণু।

(ঘ) উত্তরদিকে বা পশ্চাতে—সদ্যোজাত বা ব্রহ্মার অধিকার।

(ঙ) স্বয়ং সদাশিব ঊর্ধ্বাম্নায় বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা চতুর্দ্দিক নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

মন্তব্য ঃ—প্রথম শ্লোক উপক্রম, শেষ বা অষ্টম শ্লোক ফলশ্রুতি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের বিষয়বস্তু এক অর্থাৎ গুরুপাদুকা বর্ণনা বলিয়া একটি শ্লোক হিসাব করা হয়। প্রথম ও শেষ শ্লোক ব্যতিরেকে যে পাঁচটি শ্লোক অবশিষ্ট থাকে, তাহা "পাদুকা-পঞ্চক" নামে অভিহিত।

সাধক স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে ইহার রহস্য অবগত হইবেন, কারণ সাধন মার্গে ইহার স্থান অতি উচ্চে।

পূর্ণ পাদুকা মন্ত্র

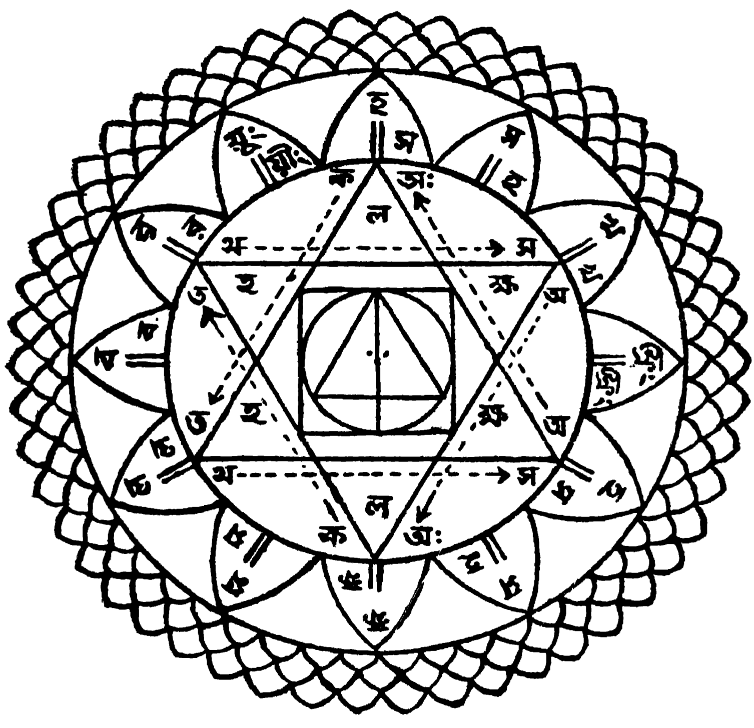
পূর্ণ পাদুকা মন্ত্র এইরূপ ঃ—

"ঐং-হ্রীং শ্রীং হ-স-খ-ফ্রেং হ-স-ক্ষ-ম-ল-ব-র-য়ুং স-হ-খ-ফ্রেং স-হ-ক্ষ-ম-ল-ব-র-য়ীং হ্সৌঃ হ্সৌঃ স্হৌঃ"

এই মন্ত্র শ্রীমদর্দ্ধকালীকুলে প্রচলিত। যদিও দুইটি দ্বাদশার্ণ, যথাক্রমে উন্মনী ও সমনী ভাবযুক্ত উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি ইহারা তত্ত্বতঃ একই। প্রকৃতি ও পুরুষ পার্থক্য ব্যতিরেকে একই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব।

যাঁহারা পূর্ণাভিষিক্ত, তাঁহারা এই মন্ত্রের অধিকারী। গুরুর নিকট হইতে এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। গুরু-পাদুকা পূজায় এই মন্ত্র কোন কোন সময় চতুস্তারীযোগে ব্যবহৃত হয়।

[বিশদ বিবরণের জন্য গুরু-পাদুকা পূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য]



পাঠকবৃন্দ যাহাতে স্তোত্রের বর্ণনা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে উপরের চিত্রটি এতৎসঙ্গে যোজনা করা হইল।

গুরুতত্ত্ব (ক)

অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূর করার যিনি সহায়ক, তিনিই গুরুপদবাচ্য। এই অজ্ঞানতা দুই প্রকার—(১) জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, (২) দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্মবিদ্যা।

প্রাথমিক বর্ণ-পরিচয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত যাঁহাদের সহায়তায় জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষক হউন, কলেজের অধ্যাপক হউন—সকলেই গুরুপদবাচ্য। কিন্তু মুক্তি পথের যিনি কাণ্ডারী, তাঁহার কথা আলাদা। আমরা এখানে শেষোক্ত গুরু এবং সেই তত্ত্ব নিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যিনি আমাদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দেন, তিনি কিন্তু বর্ণমালার রহস্য বা তত্ত্বজ্ঞান লাভে সাহায্য করেন না ; ইহা আমরা প্রাপ্ত হই আধ্যাত্মিক গুরু হইতে।

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।"

পরব্রহ্মস্বরূপ উপেয়কে প্রাপ্ত হইতে হইলে শব্দব্রহ্মই তাহার একমাত্র উপায়। শব্দব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত চৈতন্যশক্তিসম্পন্ন শব্দ বা বাক্যই মন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। এই শব্দ যাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া শিষ্যের কর্ণে এবং পরে হৃদয়ে অর্পিত হয়, তিনি ব্যবহারভূমিতে গুরুপদবাচ্য ও গুরুরূপে পূজনীয় হইলেও বাস্তবিকপক্ষে এই মন্ত্রই প্রকৃত গুরুরূপে গ্রাহ্য।

শব্দব্রহ্ম হইতে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরি—এই চতুর্ব্বিধ বাক্ উৎপন্ন হইয়াছে। বাক্ হইতে পৃথিব্যাদি সদাশিবান্ত যাবতীয় তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য শ্রীগুরু ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তিনি বিশ্বের বাহিরে শব্দব্রহ্মরূপে এবং শব্দব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া সচ্চিদানন্দরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্ণব্রহ্মের পরম স্বরূপ অব্যক্ত বলিয়া বদ্ধ জীবের কাছে

অবাঙ্মনসগোচর। জীবকে ধরা দিবার জন্য তিনি গুরুরূপে ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়া জীবকে ধরিয়া পুনরায় সেই অব্যক্তধামে পৌঁছাইয়া দেন। ইহা তাঁহার মহাকরুণা বা কৃপার বিলাস। সেই পরমধর্ম্মের সূক্ষ্ম বা অন্তরতম অংশ ধ্যানেরও গোচর নহে এবং সর্ব্বতোভাবে বিকল্পের অতীত বলিয়া 'নেতি' 'নেতি' রূপেই নির্দ্দেশযোগ্য। এই পরম ধাম সকল তত্ত্বের অতীত। তাই শ্রুতি ও বেদান্ত বাক্য গুরুকে পরমপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদ্রূপ সমুদ্রের জল স্ফীত হইলে সমুদ্র নিজবেগে তাহা নদনদীতে প্রেরণ করে, তদ্রূপ শ্রীগুরুর আত্মায় শিষ্যের কার্য্যে আনন্দ বর্দ্ধিত হইলে, তিনি স্বীয় শক্তির প্রভাবে শিষ্যের মধ্যে তাহা সংক্রামিত করিতে সমর্থ।

"দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।"

গুরু, মন্ত্র ও দেবতা—এই তিনকে এক করাই শিষ্যের সাধনা। তিনের একীকরণকে মন্ত্রচৈতন্য বলা হয়। ত্রাণের জন্য যাহা মনন্ করা হয়, তাহাই মন্ত্র। যেসব শব্দ দ্বারা ভগবদ্‌বোধ জাগে বা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়, যেগুলির নিয়মিত অনুশীলনে বা স্মরণ-মননে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়, সেগুলিকে মন্ত্র বলা যাইতে পারে। আবার জাগতিক কতকগুলি ব্যাপারে যথা সর্প দংশনে বা কয়েকপ্রকার ব্যাধি সারাইতে, মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ইহার ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়।

শব্দ উচ্চারণে যে অর্থটি ভাসিয়া ওঠে, সেই অর্থটি সেই শব্দের গুরু। গুরু অর্থে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদাতা, কারণ জ্ঞানই অজ্ঞানতার নাশক। কাহারো উপদেশে কোন বিষয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে তাহার প্রদত্ত উপদেশ বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা তাহাকে গুরু বলি।

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি আরোপ করা উচিত নহে। কারণ তিনি জ্ঞানময় পরমাত্মাস্বরূপ। মন্ত্র মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থ যদি

মনে ভাসিয়া উঠে, তখনি বলা যায় গুরু ও মন্ত্র এক হইয়াছে। আর দেবতা হইলেন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের অনুভূতি। চেতনার বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিকাশের নাম দেবতা। পরমাত্মা বোধস্বরূপ বা বোধময় এবং আমরা অনুভূতিময়। মন্ত্র উচ্চারণের সময় তাঁহার অর্থ ও অনুভূতি যদি একসঙ্গে ঘটে, তবেই মন্ত্র, গুরু ও দেবতা এক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইহাই মন্ত্রচৈতন্য বা মন্ত্রসিদ্ধি। উল্লিখিত অনুভূত প্রসঙ্গে পূজাকালে ভূতশুদ্ধির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়— **"সহোমিতি বিচিন্তয়েৎ"** অথবা **"দেবো ভূত্বা দেবমর্চ্চয়েৎ"** ইত্যাদি বাক্য।

মন্ত্র জপ এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যাহাতে হৃদ্‌গ্রন্থি স্পন্দিত হয়। শাস্ত্রে হৃদয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ—'হৃ' অর্থে আহরণ করা, 'দ' অর্থে দান করা এবং 'য়' অর্থে গতি বুঝায়। এই তিনটি অক্ষরের সমষ্টিগত অর্থ দাঁড়ায়—যাহা সমস্ত আহরণ করে, আহৃত বস্তুতে প্রাণদান করে বা তন্ময় হইয়া যায়, তাহাকে 'হৃদয়' বলা হয়। এই স্পন্দনের ফলে মন্ত্র প্রাণময় বা জীবন্ত হইয়া উঠে। এই চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার উচ্চারণ করিলে দেবতার স্বরূপ প্রকটিত হয় এবং বহুবার জপের দ্বারা সেই স্বরূপকে দীর্ঘ স্থিতি দেওয়া হয়। হৃদ্‌গ্রন্থি উন্মুক্ত হইলে আনন্দাশ্রু, পুলক, গদ্‌গদভাবে কথা বলা সম্ভব হয়। তন্ত্রে আছে—

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষ প্রজপ্তোপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধতি॥"

যিনি মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য অবগত নহেন, সেই সাধক যদি শতলক্ষ জপও করেন, তথাপি তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে জপের সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত অন্যপ্রকার সাধনা যোগ করা বাঞ্ছনীয়। মসুর ডাল শুধু সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায় না; কিছু মসলা, লবণ ইত্যাদি মিশাইয়া পাক করিলে তবেই সুস্বাদু হয়। এইভাবে গুরু প্রদত্ত সাধন ক্রিয়া নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিলে মন প্রাণ পরিপক্ক হইয়া উঠে। সেই অবস্থায়

শ্রীগুরুর অভয়বাণী কর্ণকুহরে অবিরত ধ্বনিত হইতে থাকিবে—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৮।৬৫

পদ্যানুবাদ—

"আমাতে তোমার মন কর সুস্থাপন,
আমাতেই হও তুমি ভক্তিপরায়ণ;
প্রতি যজ্ঞে কর তুমি পূজাই আমার,
আমাকেই কর তুমি কর নমস্কার;
প্রিয় তুমি, সুনিশ্চয় পাইবে আমায়,
তোমাকে কহি আমি সত্য প্রতিজ্ঞায়।"

ব্যাখ্যা—মন্মনা অর্থাৎ আমাতে (আত্মাতে) মন স্থির কর। চঞ্চল মনই জীবের বর্ত্তমান মন। প্রাণকর্ম্মাদি দ্বারা মন স্থির হইলে, চঞ্চল মন লোপপ্রাপ্ত হইবে। একমাত্র সেই অবস্থায় তুমি আমার (আত্মার) ভক্তগণ্য হইবে এবং আত্মকর্ম্ম বা আত্মযজ্ঞের উপাসক হইয়া আমাকে (আত্মাকে) নমস্কার করিবে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে নমস্কার করিবে।

বিষ্ণু পুরাণেও অনুরূপ ভাবের কথা আছে। প্রহ্লাদের যখন ভগবদ্দর্শন হয়, তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে **"নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ"** মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিয়াছিলেন।

গুরুতত্ত্ব (খ)

প্রথমে গুরু শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করা যাউক। গুরু শব্দের 'গু' কার অন্ধকারের বাচক এবং 'রু' কার তেজোরূপে কথিত হয়। অতএব 'গুরু' শব্দে অজ্ঞানতা নাশক 'ব্রহ্ম' পদার্থ বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বর্ণ 'গু' কার মায়া এবং তাহার সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণত্রয়কে বুঝায় এবং 'রু' কার মায়ারূপ ভ্রান্তির বিমোচক। সুতরাং উভয় অক্ষরের সমষ্টিগত অর্থ সেই ব্রহ্মপদই বুঝায়। তৃতীয়তঃ, 'গু' কার অর্থে অন্ধকার এবং 'রু' কার অর্থে সেই অন্ধকারের নাশককে বুঝায়। এইজন্যই তিনি গুরু।

নিরাকার ব্রহ্ম জীবের অজ্ঞান ও মায়ান্ধকারের ঘোর বা মোহ কাটানোর জন্য তাঁহার অন্তর্নিহিত কৃপাশক্তিতে বিগ্রহ বা সাকার রূপ ধারণ করতঃ মনুষ্যদেহে ব্রহ্মনাড়ীর মুখে সহস্রদল পদ্মে আবির্ভূত হন। এইভাবে নিরাকার ব্রহ্মের মনুষ্যদেহে অধিষ্ঠান।

এই প্রসঙ্গে 'শিষ্য' শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, কারণ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া চলিতে থাকে। শাস্ ধাতু ক্যপ্ প্রত্যয়ে 'শিষ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মনের ভাবসমূহকে যিনি শাসন করিতে সমর্থ, একমাত্র তিনিই যোগ্য শিষ্য হইবার অধিকারী।

ভারতের মানুষ-গুরুগণ ব্রহ্মকে জ্ঞেয় অর্থাৎ জানা যায় বলিয়াছেন! তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও সাধনার ফলে মানুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের গোচর হইয়া থাকেন। যেমনটি আমরা পাই ধ্রুবের উপাখ্যানে। তাঁহারা বলেন—"আমরা ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছি; তোমরাও ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে দেখিতে পারো। তাঁহাকে দেখিলে শোক-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবে।"

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) সত্যদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ভগবানকে কি দেখা যায়?' উত্তর দিলেন ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ—'হ্যাঁ, তাঁহাকে দেখা যায়। আমি যেমন তোমাকে দেখিতেছি, সেইরূপ তাঁহাকেও দেখা যায়।' এমন আশ্বাসপূর্ণ অভয়বাণী শুনিয়াই যুবক নরেন্দ্রনাথ ঐ মানুষ গুরুর চরণতলে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এই আত্মনিবেদনের ফলে বিশ্বজগৎ তাঁহার মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল।

গুরু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য রাজর্ষি জনককে বলিয়াছিলেন—'হে সম্রাট! ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে।' তখন রাজর্ষি জনক উত্তর দিলেন—'হে ভগবন্! বিদেহ রাজ্য আপনাকে দান করিলাম, তৎসঙ্গে নিজেকেও নিবেদন করিলাম।'

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে আদর্শ গুরু-শিষ্য সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

"আদিনাথো মহাদেবি মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ।
গুরু স এব দেবেশি সর্ব্বমন্ত্রেষু না পরঃ॥"

যিনি আদিনাথ মহাকাল বলিয়া উক্ত হন, তিনি সকল মন্ত্রের দীক্ষা বিষয়ে গুরু। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকলেরই তিনি গুরু। মন্ত্র প্রদানকালে মনুষ্যবিগ্রহে সেই মহাকালই অধিষ্ঠান করেন। মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যে ধ্যান করেন, শিষ্যও আপন সহস্রারে সেই ধ্যানই করিয়া থাকেন।

"অতএব মহেশানি এক এব গুরু স্মৃতঃ।" তাই গুরু এক।

শিবের যাহা সূক্ষ্মস্বরূপ, তাহা সর্ব্বব্যাপী, নিষ্কল, অব্যয়, ব্যোমাকার, অনাদি, অনন্ত ; সেই নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে পূজার বিষয় হইবে? এই কারণে পরমগুরু মানুষ-রূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। সাধক তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও আরাধনা করিলে, তিনি ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রদান করেন।

গুরু, মন্ত্র ও দেবতার একত্রীকরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। ইহার অর্থ মন্ত্রে বোধময় হওয়া। শব্দ, অর্থ এবং বেদন একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অক্ষরসকল গ্রথিত হইয়া ভাব হয়, আর ভাব ঘন

হইয়া ক্রিয়া হয় বা আকার প্রকাশ পায়, কিন্তু মূলে অক্ষর সমষ্টি। ভাব সকলকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিতে হয়। ইহাই লয় হওয়া। এই তত্ত্ব-রহস্য গুরুর নিকট হইতে সম্যক্ অবগত হইয়া আয়ত্ত করিতে হয়।

ঘট, কলস ও কুম্ভ শব্দ যেরূপ একই পদার্থের বাচক, গুরু, মন্ত্র ও দেবতা তদ্রূপ একই তত্ত্বের বাচক। যাহা দেবতার স্বরূপ, তাহা মন্ত্রের স্বরূপ, এবং যাহা মন্ত্রের স্বরূপ, তাহাই গুরুর স্বরূপ। এইরূপে দেবতা, মন্ত্র ও গুরু—এই ত্রিতত্ত্বে যাঁহার অভেদজ্ঞান, সিদ্ধি তাঁহার অদূরবর্ত্তিনী।

বিভিন্ন প্রতিমায় যেমন একই জগন্মাতার আবির্ভাব, তদ্রূপ মনুষ্য গুরুর পার্থিব দেহ পৃথক হইলেও অভিন্ন গুরুতত্ত্বের দিক হইতে এক। তাই শাস্ত্রে পাই—

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

আমার যিনি রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা; যিনি আমার গুরু, তিনিই জগতের গুরু; যিনি আমার আত্মা, তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা; অতএব সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি। এই কারণে সমস্ত তন্ত্রে গুরুর ধ্যান ও মন্ত্র একইরূপ কথিত হইয়াছে।

সর্বোপরি চাই শরণাগতি বা আত্মনিবেদন। জগতে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা গুরুভক্ত সম্পন্ন করার সামর্থ্য না রাখেন। আশ্রয় দাতা সবসময় শরণাগতের দায়িত্বভার নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন। মাছের আশ্রয়দাতা জল। সেই কারণে একটি ছোট মাছ খরস্রোতা নদীতে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে উজানে সাঁতার দিতে পারে, অথচ মহাকায় হস্তী সেই তীব্র স্রোত অতিক্রম করিতে পারে না। ঠিক সেইভাবে সদ্‌গুরুর আশ্রিত এবং শরণাগত ব্যক্তি মাছের মতো অনায়াসে ভবনদী পার হইতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমান গুরুর প্রভাবে রিপুগুলি বশীভূত হইয়া সাধকের মোক্ষপ্রাপ্তির পথ

প্রশস্ত করিয়া দেয়। শরণাগত ব্যক্তি আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখিবেন এবং অহরহ প্রার্থনা জানাইবেন দয়াঘন শিবাত্ম-বিগ্রহের কাছে যাহাতে চিত্তের উপর তাঁহার নিত্য-আসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"গুরুকৃষ্ণ যার প্রতি হন সুপ্রসন্ন
গুরুভক্ত নহে কোন কার্য্যে অবসন্ন।"

গুরুগীতায় আছে—মানব কোটি জন্ম পর্য্যন্ত যে সমস্ত জপ, ব্রত, তপস্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সে সকল গুরুদেবের সন্তোষ মাত্রেই সফল হয়। অবশেষে গুরুগীতা হইতে একটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া আলোচনা শেষ করি।

"তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীতি বৈ শ্রুতিঃ।
কর্ম্মণা বচসা চৈব সর্ব্বদারাধয়েদ্ গুরুম্ ॥"

নেতি নেতি ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ গুরুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; অতএব কায়মনোবাক্যে সেই গুরুদেবকে সর্ব্বদা আরাধনা করা উচিত।

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং
ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুম্।